

বিমান বিশারদ

দেবব্রত বসু

• আমরাও হতে পারি •

পঞ্চম বই

দেবব্রত বসু

• বিমান বিশারদ •

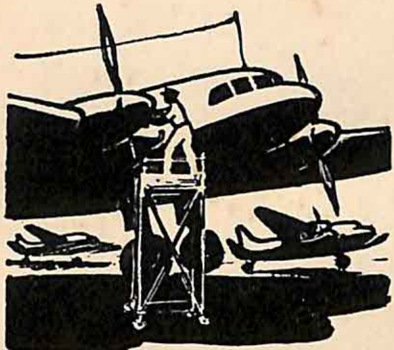
"স্বাক্ষর" প্রকাশিত : "বেঙ্গল পাব্লিশার্স" পরিবেশিত।

প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৫৬

প্রকাশক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, স্বাক্ষর লিমিটেড, ১১বি চৌরঙ্গি টেরাস, কলকাতা, ২০ ।।। মুদ্রাকর শ্রীনিত্যগোপাল চৌধুরী জয়হিন্দ প্রিন্টিং অ্যাণ্ড বাইণ্ডিং ওয়ার্কস, ৪২, আপার সারকুলার রোড, কলকাতা ৯ ।।।
বাঁধাই : ওরিয়েণ্ট বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

দাম ঃ আড়াই টাকা

প্রচ্ছদপট : খালেদ চৌধুরী



বিমান বিশারদ

দেবব্রত বসু

॥ এক ॥



পাইলট নেমে আসছিল।

তখন বাঙলায় যাকে বলে ব্রাহ্মমুহূর্ত : রাত্রি যায়-যায়, আলো ফুটি-ফুটি করছে।

২০ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে প্লেন উড়ে আসছিল। মাথার ওপরে অসীম আকাশ, পায়ের নিচে অনন্ত সমুদ্র। সেই আকাশ আর সমুদ্রকে বেষ্টন করে, চতুর্দিক ব্যাপ্ত করে আস্তে আস্তে আলো ফুটে উঠছে।

হঠাৎ দশদিক উদ্ভাসিত করে—সূর্যের উদয়।

পূর্ব আকাশকে অগ্নিময় করে সূর্য উঠছে।

কী নেশায় পেলো আমাদের পাইলটকে—প্লেনটাকে সে তরতরিয়ে নামিয়ে নিয়ে এলো ১০ হাজার ফুট নিচে।

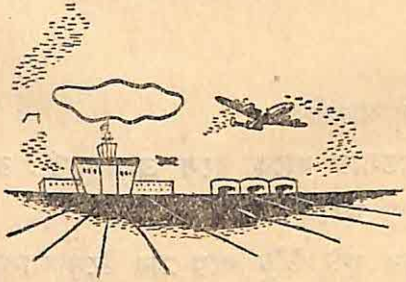
নিচে এসে আবার সেই দৃশ্য, যে-দৃশ্য বারবার দেখলেও চোখের তৃষ্ণা মেটে না: পাইলট দেখলো সূর্য উঠছে! জবাফুলের মতো টকটকে-লাল সূর্য।

পাইলট দু বার সূর্যোদয় দেখলো, একই সকালে।

এক সকালে দু বার সূর্য-ওঠা দেখে কে?

তারাই দেখে যারা আকাশে ওড়ে।

সেই আকাশে ওড়ার গল্প তোমাদের শোনাবো।



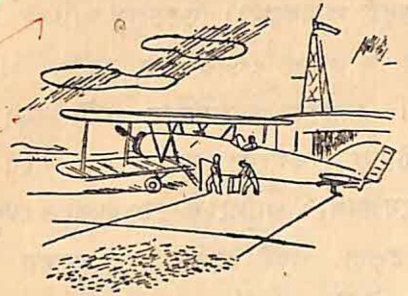
॥ দুই ॥

পৃথিবীর বিস্তারকে মানুষ বহুদিন জয় করেছে, দূরকে নিকট করেছে। পৃথিবীর গভীরতাকেও মানুষ জয় করেছে, খনির নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে সে আলো ফেলেছে।



কিন্তু অনেক, অনেক দিন পর্যন্ত আকাশের দিকে মানুষ কেবল চেয়েই থেকেছে। সেখানে পৌঁছতে পারে নি।

বিংশ শতাব্দীতে সেই অগম্য আকাশও মানুষের চলাচলের সীমার মধ্যে এসে গেছে। শুধু যে সীমার মধ্যে এসে গেছে তাই নয়, সীমারও ওপারে আছে এখনো-অদেখা যে-এক জগৎ, সেই জগতের ছবিও আজ মানুষের চোখে ঝিলিক দিয়ে উঠেছে।



মানুষের এই আকাশ-জয়ের সাধনা কি এক দিনের? কতো মনীষী এই নিয়ে চিন্তা করেছেন, কতো কর্মী অনলস পরিশ্রম করেছেন। মানুষের আকাশ-জয়ের কাহিনী সেই অসংখ্য মানুষের বীরত্ব আর আত্মোৎসর্গের কাহিনী। যারা একই সকালে দু বার সূর্য-ওঠা দেখে তাদের কাহিনী।

মানুষের আকাশে ওড়ার স্বপ্ন কি আজকের! প্রাচীন মানুষের পুরাণে কাব্যে লোকগাথায় আকাশভ্রমণের বর্ণনা বারেবারে এসেছে। বাল্মীকির রামায়ণে আমরা পুষ্পকরথে আকাশভ্রমণের বর্ণনা পাই। রামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধার করে পুষ্পকরথে চড়ে দেশে ফিরে আসছেন।

গ্রীক পুরাণে ডিডেলুস নামে এক বিশ্বকর্মার কাহিনী আছে। তিনি খুব বড়ো ইঞ্জিনীয়র ছিলেন, মিনস শহরে তিনি এমন এক গোলকধাঁধা বানিয়েছিলেন যে একবার সেখানে ঢুকলে বেরোনো শক্ত হত। দেশের রাজা একবার ডিডেলুস আর তাঁর ছেলে ইকারুসকে জেলে পোরেন। জেল থেকে উড়ে পালাবার জন্যে ডিডেলুস নাকি পাখির মতো একজোড়া ডানা তৈরি করেছিলেন।

কিন্তু এ শুধুই কবিকল্পনা। ডিডেলুস সত্যিই উড়তে পারেন নি। মানুষের আকাশে ওড়ার স্বপ্ন বহুদিন পর্যন্ত শুধু স্বপ্ন হয়েই ছিলো। মানুষের এ-ব্যর্থতার একটা বড়ো কারণ হলো, ওড়া-ব্যাপারটাকে ঠিকমতো বুঝতে না পেরে মনে একটা ভুল-ধারণা পুষে রাখা। পাখিদের ওড়া দেখতে দেখতে মানুষের এ-কথা মনে হওয়া খুবই সম্ভব যে ওদের মতো ডানা নাড়তে পারলেই উড়তে পারা যায়। শুধু সম্ভব নয়, প্রাচীন মানুষ বাস্তবিকই তাই মনে করতো। ডিডেলুসও তাই মনে করেছিলেন। কিন্তু ডিডেলুসের মতো একজন প্রমাণ ওজনের মানুষকে আকাশে তুলতে হলে বিপুল শক্তির প্রয়োজন। সে-শক্তির সন্ধান ডিডেলুস পান নি।

সেকালের মানুষের আরেকটি ভুল ধারণা ছিলো। প্রাচীন গ্রীসের এক পণ্ডিত—অ্যারিষ্টটল—থেকে ভুলটির শুরু। অ্যারিষ্টটল বলেছিলেন, তীর বা ঐ-জাতীয় অভিক্ষিপ্ত জিনিস (যাকে ইংরেজিতে বলে প্রোজেক্টাইল) যখন ওড়ে তখন পেছনকার বাতাস তাকে ঠেলা মারে।

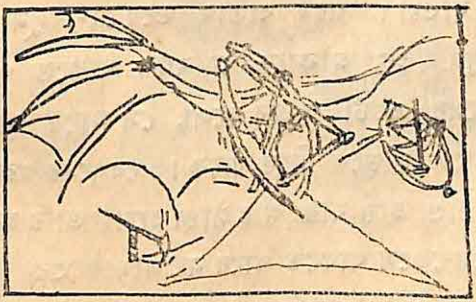
কথাটা একেবারেই ভুল। আসলে, বাতাস তীর ও অভিক্ষিপ্ত জিনিসের গতি রুখে দিতে চেষ্টা করে।

ষোড়শ শতাব্দীতে ইতালিতে একজন মহামনীষীর জন্ম হয়। তাঁর নাম লেঅনার্দো দা-ভিঞ্চি। তিনিই অ্যারিষ্টটলের ভুলটা প্রথম ধরলেন। বাতাসের ভেতর দিয়ে পাখির ওড়া আর সম্মুখে-ধাবমান পদার্থের গতি খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে তিনি এই সিদ্ধান্ত করলেন যে, বাতাস পদার্থের গতি রোধ করে।



প্রায় পাঁচশো বছর আগে বিখ্যাত শিল্পী লেঅনার্দো দা-ভিঞ্চি এই রকম উড়োজাহাজের নকশা তৈরি করেছিলেন। তাঁর খাতা থেকে এখানে দুটি ছবি তুলে দেওয়া গেলো। তাহলে, আকাশ-জয়ের পরিকল্পনা কম দিনের পুরনো নয়!

আগেকার দিনে মানুষ নিজে আকাশে উড়তে না শিখলেও ঘুড়ি ওড়াতে শিখেছিলো। আমাদের দেশের ছেলে-



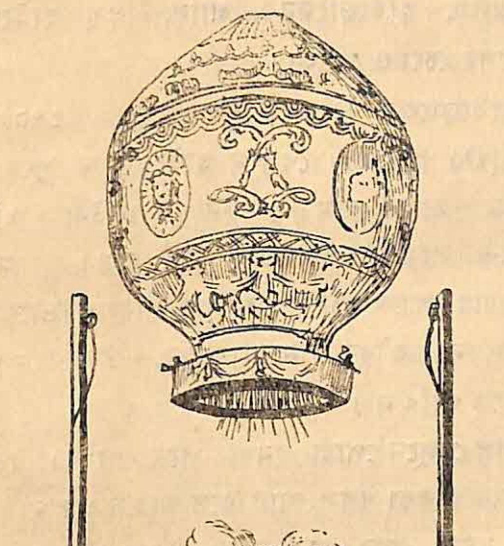
মেয়েদের ঘুড়ি ওড়ানোর কী সাংঘাতিক নেশা সে কি আর ব্যাখ্যা করে বলতে হবে! মনে কোরো না, এ-নেশার বয়েস খুব অল্প। চীনদেশেও ঘুড়ি ওড়ানোর শখ প্রচণ্ড আর সে-শখ বহুকাল আগে থাকতে চলে আসছে।

প্রাচীন মানুষ আর কী ওড়াতে শিখেছিলো? বেলুন। শুধু বেলুন ওড়ানো নয়—মানুষের বেলুনে চেপে নিজে ওড়ার ইতিহাস প্রায় দু-তিন শো বছরের পুরনো। কিছুদিন আগে রাজপুতানার গোয়ালিয়রে একটি পুরনো পুঁথি পাওয়া গেছে; তাতে লেখা আছে কী করে বড়ো বড়ো বেলুন তৈরি করে আকাশে ওড়া যায়। পুঁথিটা খুব সম্ভবত ষোলো বা সতেরো শতকে লেখা।

ঘুড়ি যে-নিয়মে ওড়ে বেলুন কিন্তু সে-নিয়মে ওড়ে না। বেলুনের ভেতরকার বাতাস আশপাশের বাতাসের চেয়ে হালকা বলে বেলুন ওড়ে। বেলুনের ভেতরকার বাতাস হালকা হলো কেন? তাপ পেয়ে। গরম বাতাস ঠাণ্ডা বাতাসের চেয়ে হালকা; আর গরম ও হালকা বাতাসের স্বভাবই হলো ওপর দিকে উঠে যাওয়া। গরম বাতাস ভরে যে-বেলুন ওড়ানো হয় সে-বেলুন কিন্তু আকাশে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। গরম জিনিসের একটা স্বভাব হলো, সে আস্তে আস্তে তার তাপ চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে থাকে। বেলুনের গরম বাতাস ওপরে উঠে ঠাণ্ডা হয়ে যায়, আর ঠাণ্ডা হলেই ভারি হয়ে যায়। তখন আর সে ভেসে থাকতে পারে না, নামতে শুরু করে।

বেলুনে চেপে যিনি সর্বপ্রথম আকাশে ওড়েন তাঁর নাম

জানতে ইচ্ছে করে না? প্রথম বেলুন-বিহারী একজন নন, দুজন—দুই ভাই। তাঁদের নাম মঁগল্ফিয়ে (Montgolfier)—ফ্রান্সের লোক ছিলেন তাঁরা। তাঁদের বেলুনে ওড়া সফল হতে দেখে ইউরোপে একটা দারুণ সাড়া পড়ে গেল।



১৭৮৩-তে তৈরি এই বেলুনটিতে চেপে মানুষ প্রথম আকাশে উড়লো—আগুন জ্বালিয়ে, গরম হাওয়া বেলুনে পুরে কী ভাবে বেলুনকে আকাশে ওড়াবার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো তা এই পুরনো ছবিটি থেকেই আঁচ করা যাবে।

আঠারো শতকের শেষাশেষি ইউরোপে বেলুনে-ওড়া মস্ত একটা শখের জিনিস হয়ে দাঁড়ালো।

প্রথম প্রথম গরম বাতাস ভরে বেলুন ওড়ানো হতো। পরে তার বদলে হাইড্রোজেন ব্যবহার করা হতে লাগলো। বাতাসও গ্যাস, হাইড্রোজেনও গ্যাস, কিন্তু হাইড্রোজেন গরম বাতাসের চেয়েও হালকা।

কিন্তু হাইড্রোজেন ব্যবহারে বিপদ আছে। ১৭৯৫ সালে ত্য রজিয়ে (De Rozier) বেলুনে হাইড্রোজেন পুরে উড়তে গিয়ে পুড়ে মারা যান। কেন এ-দুর্ঘটনা ঘটলো? হাইড্রোজেনে সহজেই আগুন ধরে যায়। মানুষের আকাশে ওড়ার স্বপ্নকে সত্য করতে গিয়ে যাঁরা এইভাবে জীবন বিপন্ন করেছেন,—জীবন দান করেছেন,—তাঁদের কাউকেই আমরা ভুলতে পারি না।

আজকাল বেলুনে পোরা হয় হিলিয়ম গ্যাস। হিলিয়ম হলো সবচেয়ে হালকা গ্যাস, আর এতে আগুন ধরে না।

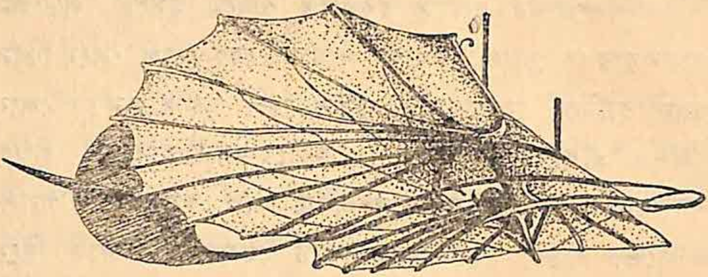
বেলুন যতো বড়ো হবে ততো উঁচুতে উঠবে। ১৮৬৩ সালে কক্স্‌ওয়েল আর গ্ল্যাশিয়ার নামে দুজন বেলুন-বিহারী খুব ঢাউস একটা বেলুনে চড়ে সাত মাইল পর্যন্ত উঠলেন। মানুষ এই প্রথম আকাশের উচ্চতা মাপলো।

পৃথিবীর পিঠ থেকে সাত মাইল উঁচুতে যে-জায়গা, সে-জায়গা কেমন? দুজনের কেউ তা জানতেন না। সেখানে বাতাস পাতলা, বাতাসের চাপ কম, বাতাসে অক্সিজেনের ভাগ অতি সামান্য।

অক্‌সিজেনের ঘাটতি হওয়াতে প্রথমে মুষড়ে পড়লেন গ্ল্যাশিয়ার। চোখে দেখতে পান না, দেহ অবশ, শেষে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। কক্‌স্‌ওয়েল যুঝছিলেন; শেষে তিনিও এলিয়ে পড়লেন। একেবারে জ্ঞান হারাবার আগে শরীরের বাকি সবটুকু শক্তি একত্র ক'রে, কক্‌স্‌ওয়েল গ্যাস-ভাল্‌ভের দড়িটা দাঁত দিয়ে কেটে ফেললেন। দাঁত দিয়ে কেন? হাত দিয়ে নয় কেন? হাত যে তখন ঠাণ্ডায় জমে অবশ হয়ে গেছে! যাই হোক, দড়িটা কেটে দেওয়াতে একটু একটু করে গ্যাস বেরিয়ে যেতে লাগলো—বেলুন নিচে নামতে শুরু করলো। খানিকটা নামতে, নিচের আকাশে অক্‌সিজেন পেয়ে দুজনে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। সেই থেকে মানুষের আক্কেল হয়েছে, খুব উঁচুতে উঠতে গেলে এখন আমরা অক্‌সিজেন সঙ্গে নিয়ে যাই।

আজকাল বেলুনের চলন নেই বললেই হয়। বেলুনের অনেক অসুবিধে আছে: বেলুনে ওড়া যায়, কিন্তু ইচ্ছেমতো দরকারমতো, ওড়া যায় না—বাতাসের টান যেদিকে বেলুন সেই-দিকে উড়বে। তোমার যাবার দরকার হয়তো পাটনায়; বাতাস তোমাকে ঠেলতে ঠেলতে এনে হাজির করলো ধরো গয়ায়।

বেলুন ওড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে মানুষ গ্লাইডার ওড়াতে শিখলো। গ্লাইডার কী? গ্লাইডারও এক রকম ওড়ার যন্ত্র। বাইরে থেকে দেখলে এরোপ্লেনের সঙ্গে আজকালকার গ্লাইডারের তেমন কোনো তফাত চোখে পড়বে না। আসল তফাতটা ভেতরে—এরোপ্লেনে ইনজিন আছে, গ্লাইডারে নেই।



অটো লিলিয়ান্থ্যাল্ বলে একজন জার্মান অধ্যাপক এই গ্লাইডারটি তৈরি করেন! এর দুটি ডানায় এবং লেজে পাখির চেহারা নকল করবার পরিচয় রয়েছে। অধ্যাপক লিলিয়ান্থ্যাল্ স্বয়ং এই গ্লাইডারে চেপে আকাশে ওড়বার চেষ্টা করতে করতেই মারা যান—পৃথিবীর প্রথম বিমান-বিশারদদের মধ্যে অনেকেই এই ভাবে আকাশ-জয়ের চেষ্টায় প্রাণ দিয়েছেন।

শোনা যায়, ১৬৭৮ সালে বেসমার নামে এক ভদ্রলোক গ্লাইডার চড়ে আকাশে উড়তে চেষ্টা করেন। তাঁর ব্যবহৃত গ্লাইডারের ছবিও পাওয়া যায়। ১৭৪২ সালে মারকুইস দ্য বাকেভিল (Marquis de Bacqueville) নামে একজন ফরাসী ভদ্রলোক সেন্ নদীর ওপর দিয়ে গ্লাইডার ওড়াতে চেষ্টা করেন। তিনি তাঁর হাতে-পায়ে বড়ো-বড়ো প্যাড্ল্ সেঁটে নিয়ে লাফ দেন। প্যাড্ল্ কেন? বাতাস কাটবার জন্যে। কিন্তু উড়তে তিনি পারেন নি—এক ধোপানীর কাপড়কাচা পাটের ওপর পড়ে গিয়ে তিনি জখম হন।

এরোপ্লেন মাটি থেকে নিজের জোরে উঠতে পারে। জোরটা আসে কোথা থেকে? ইনজিন থেকে। গ্লাইডারে ইনজিন নেই, তাহলে গ্লাইডার কী করে ওড়ে?

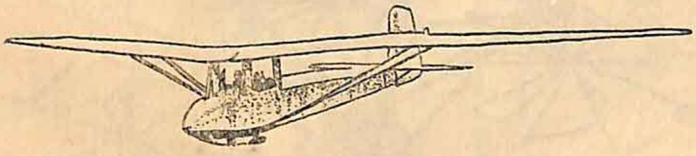
যে-সব পাখি খুব উঁচু দিয়ে ওড়ে,—যেমন চিল, শকুন—তাদের ওড়া লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ওরা ওড়বার সময় ডানা ঝাপটায় না, ডানাজোড়া শুধু বাতাসে মেলে দিয়ে উঁচুতে উঠে যায়।

ওরা এটা কী করে পারে? বাতাসের বেগ যখন ওপর-মুখী, ওরা তখন সেই বাতাসে ডানাজোড়াকে মেলে দেয়, ওপর-মুখী বাতাসই ওদের ঠেলে তুলে নিয়ে যায়।

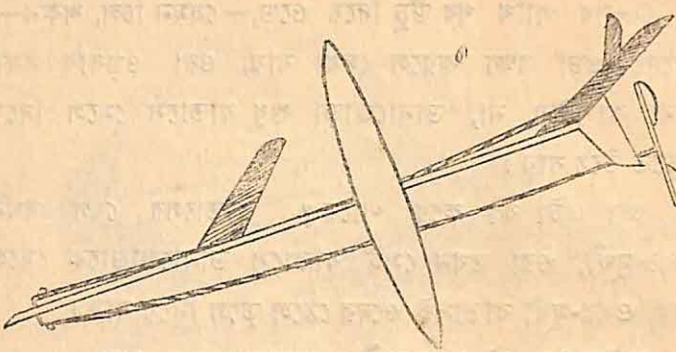
গ্লাইডারও এই ওপর-মুখী বাতাসের ঠেলায় ওড়ে।

বাতাসের এই ওপরমুখী স্রোত কি সব সময়েই বা সব জায়গাতেই বয়? না, তা বয় না। ইনজিন-হীন গ্লাইডারও সেইজন্যে সব সময়ে বা সব জায়গা থেকে ওড়ানো যায় না।

মনে করা যাক, এরোপ্লেনে উড়ছি। আচ্ছা, আকাশের মাঝখানে হঠাৎ যদি ইনজিন বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে কী হবে বলো? এয়ারোপ্লেন সোঁ-সোঁ করে মাটির দিকে নেমে আসবে। নামতে নামতে প্লেন যদি এমন এক পাহাড়ের কিনারে গিয়ে পৌঁছয় যেখানে বাতাস পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে



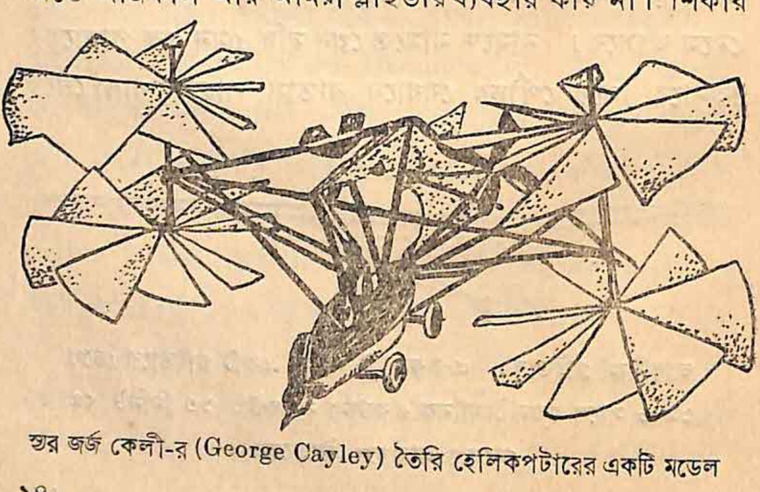
আধুনিক গ্লাইডার। এ-রকম টু-সিটার একটি গ্লাইডারে চেপে ১৯৩৮ সালে দুজন বৈমানিক একটানা ২২ ঘণ্টা, ১৩ মিনিট ৩৫ সেকেণ্ড আকাশে উড়েছেন।



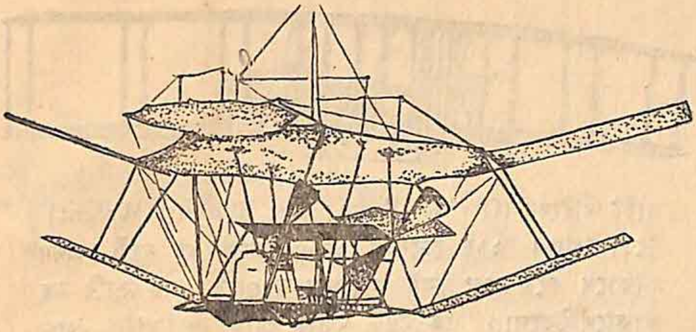
এফ. ডব্লিউ. ল্যান্চেস্টারের (F. W. Lanchester) তৈরি একটি গ্লাইডারের মডেল

ওপর-মুখী স্রোতে বইছে, তাহলে কী হবে? আন্দাজ করা যাক। আমাদের প্লেন তখন আর না নেমে সেই বাতাসের ঠেলায় আবার ওপরে চড়তে শুরু করবে।

গ্লাইডারকে বলা যায় এরোপ্লেনের পূর্বপুরুষ। যাতায়াতের জন্যে আজকাল আর আমরা গ্লাইডার ব্যবহার করি না। শিকার



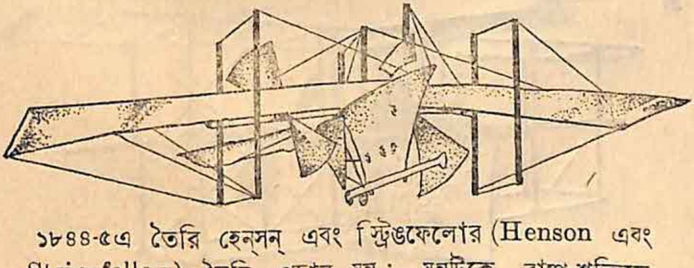
স্যর জর্জ কেলী-র (George Cayley) তৈরি হেলিকপটারের একটি মডেল



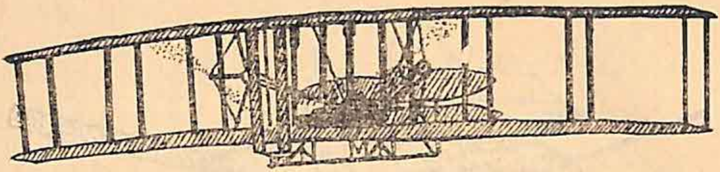
সর্বপ্রথম উড়ন্ত যন্ত্রের মধ্যে এটি হলো একটি। এটি তৈরি করেছিলেন স্যর হিরাম স্টিভেন্স্ ম্যাক্সিম (Hiram Stevens Maxim)—১৮৯৪ সালে এটিকে প্রথম ওড়াবার চেষ্টা করা হয়।

করা, সাঁতার দেওয়া, সাইকেল দৌড় বা মোটর-দৌড়ের মতো এখন আমরা খেলাধূলা বা ছুটির দিনের ফুর্তির অঙ্গ হিসেবে গ্লাইডিং করি, অর্থাৎ গ্লাইডারে চড়ে আকাশে উড়ি।

আমরা গ্লাইডারকে বলেছি এরোপ্লেনের পূর্বপুরুষ। কেননা আজ আমরা গ্লাইডারে চড়ে দেশদেশান্তরে যাওয়া-আসা করি না বটে, কিন্তু গ্লাইডার ওড়াবার চেষ্টা করতে করতেই মানুষ শেষ পর্যন্ত এরোপ্লেনে উড়তে শিখেছে।

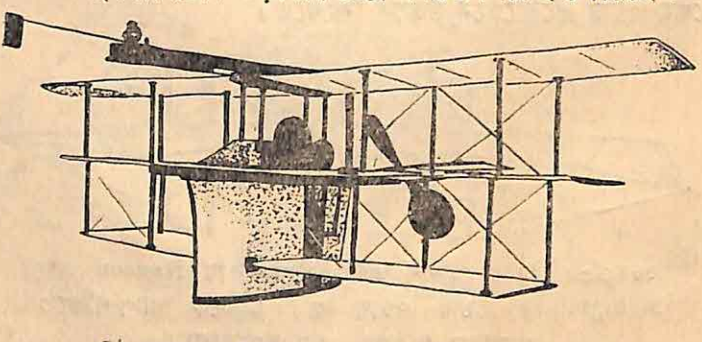


১৮৪৪-৫এ তৈরি হেন্সন্ এবং স্ট্রিঙফেলোর (Henson এবং Stringfellow) তৈরি ওড়ার যন্ত্র; যন্ত্রটিকে বাষ্প-শক্তিতে চালাবার পরিকল্পনা করা হয়েছিলো।

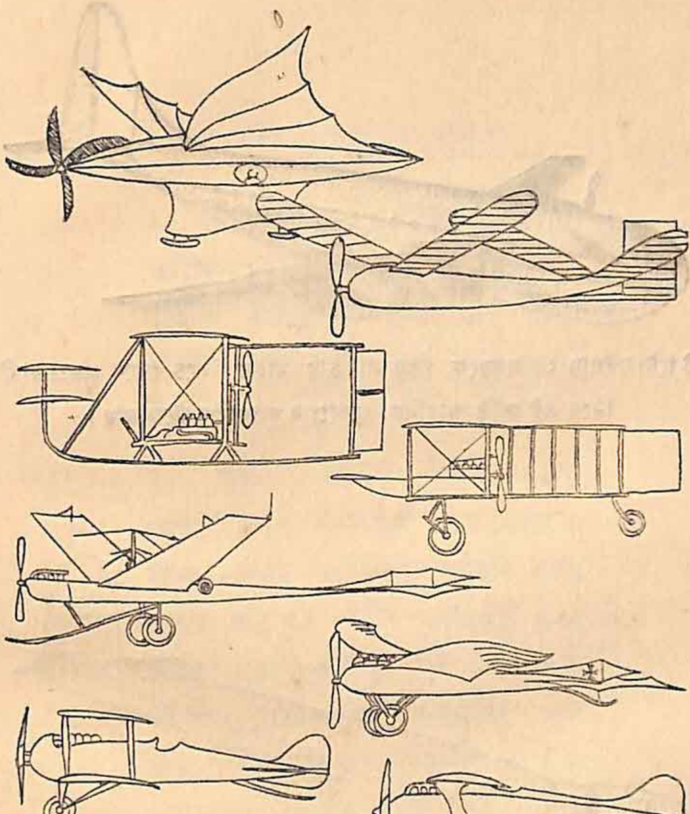


রাইট ভাইদের (Orville Wright এবং Wilbur Wright) উড়োজাহাজ। ১৭ই ডিসেম্বর ১৯০৩ সালে এই যন্ত্রটি প্রথম আকাশে ওড়ে এবং সেই সর্বপ্রথম হাওয়ার চেয়ে ভারি যন্ত্র আকাশে উড়লো। এই যন্ত্রটি ঘণ্টায় প্রায় দশ মাইল বেগে আকাশে ছুটেছিলো।

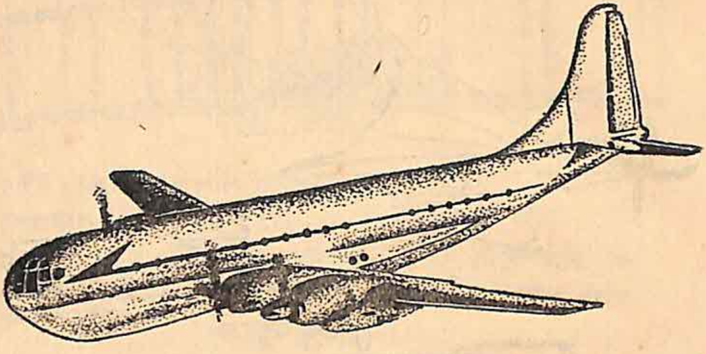
ওড়ার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটা কী? ওড়ার যন্ত্রের আসল শরীরটার গড়ন কেমন হওয়া উচিত? ডানা বা উইঙ্গ-এর গড়নটাই বা কেমন হলে উড়তে সবচেয়ে সুবিধে হয়? এরোপ্লেনকে পাইলটের বশে রাখতে হলে, তাকে ইচ্ছামতো উড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে হলে, ডাইনে-বাঁয়ে ঘোরাতে হলে, ওপর-নিচ করাতে হলে উইঙ্গ বা ডানা ছাড়াও আর কী কী যন্ত্রপাতি থাকা দরকার?—এই সমস্ত বিষয়ের প্রথম শিক্ষা মানুষ গ্লাইডার ওড়াবার চেষ্টা করতে গিয়েই পেয়েছে।



স্ট্রিঙফেলোর তৈরি বাষ্পচালিত উড়োজাহাজ।



১৮৯০ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত এরোপ্লেনের মডেল-এর উন্নতি।



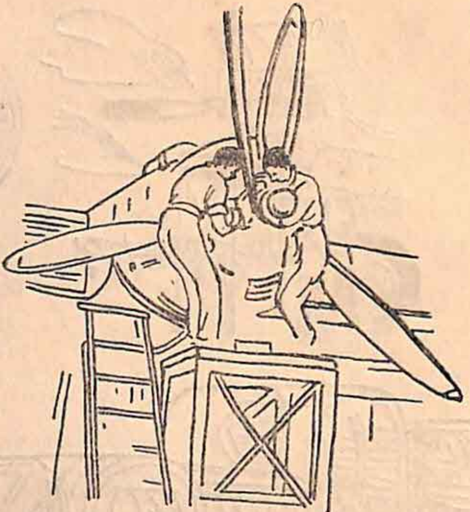
স্ট্রাটোক্রুইসার : সমুদ্রকে তিন বা চার মাইল নিচে রেখে অজস্র যাত্রী নিয়ে এই অতি আধুনিক এরোপ্লেন আকাশে উড়ে যায়।



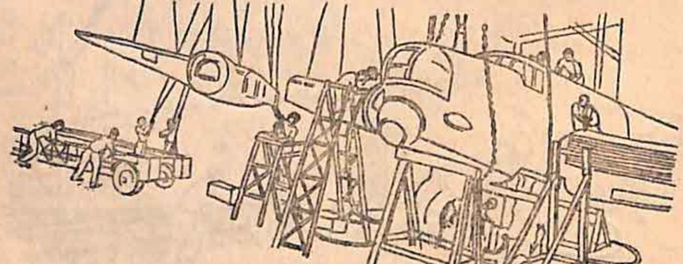
পরীক্ষামূলক আধুনিক এয়ারোপ্লেন। এর শুধু দুদিকে দুটি ডানা, কিন্তু সাধারণ এরোপ্লেনের মতো টেল্ বা পিছন দিককার অংশ নেই। ঘণ্টায় ৫০০ মাইল পর্যন্ত এর গতিবেগ উঠতে পারে।

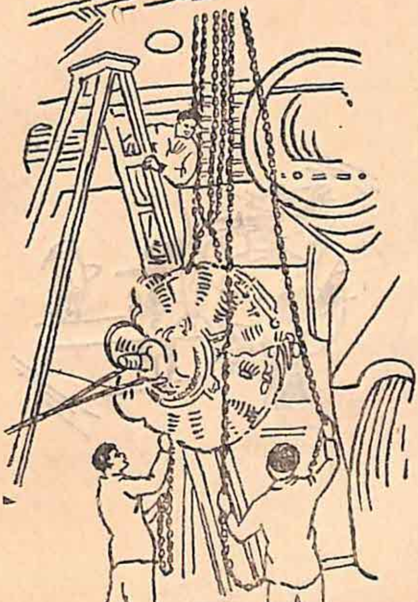
২০, ২১, ২২ এবং ২৩ পৃষ্ঠার ছবিগুলি পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারা যাবে যে একটি আধুনিক এরোপ্লেন তৈরি করবার সময় কতো রকম অংশ জোড়া দিতে হয়।

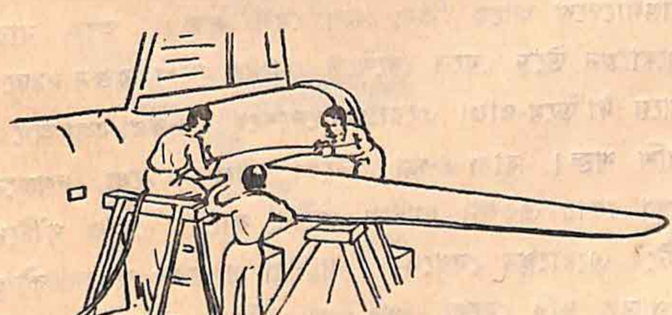
২০ পৃষ্ঠার ছবিতে একটি এরোপ্লেনকে যেন কাটাকুটি করে দেখানো হচ্ছে—যেমন শরীরতত্ত্ব পড়বার সময় ছাত্ররা মানুষের শরীর কাটাকুটি করে দেখে নেয় কোথায় কী আছে-না আছে। তারপরের তিনপাতা ধরে নানান ছবি দিয়ে দেখানো হয়েছে এরোপ্লেন তৈরির কারখানায় কেমন করে ওই সব নানান অংশ জোড়া লাগিয়ে গোটা এরোপ্লেন তৈরি করে ফেলা হয়।

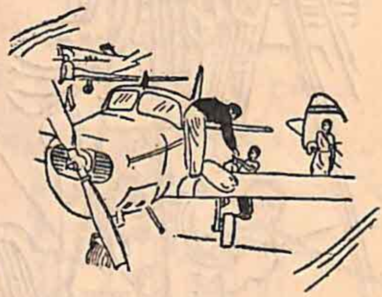






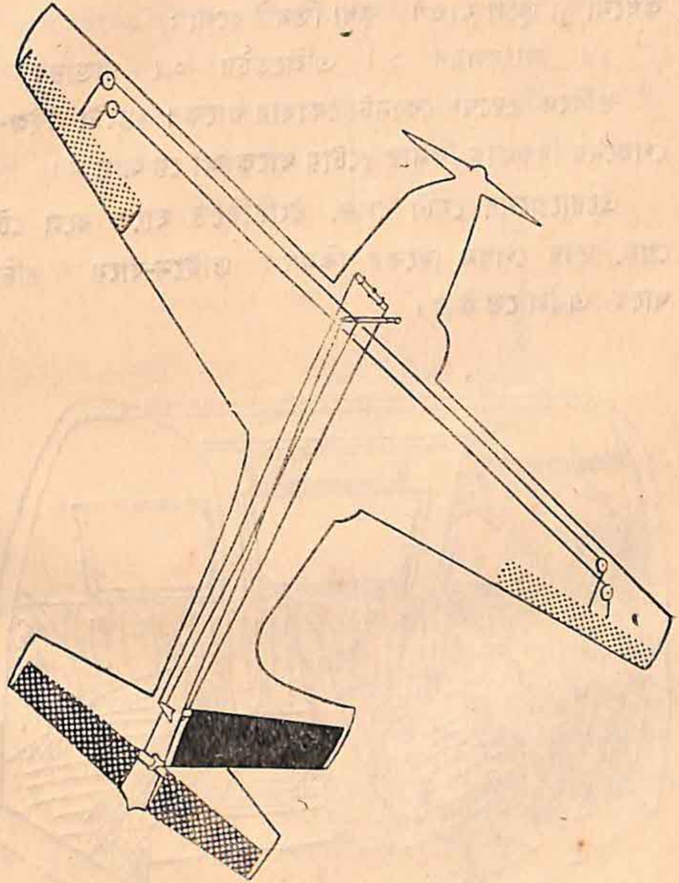






॥ তিন ॥

নিচের থেকে উড়ন্ত এরোপ্লেন দেখে নি এমন ছেলে বাঙলাদেশে আছে কিনা বলা বেশ শক্ত। আর যারা এরোপ্লেন উড়ে যেতে দেখেছে তাদের মধ্যে কজন দমদমে গিয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা এরোপ্লেন দেখেছে সে-কথা বলা আরো বেশি শক্ত। যারা এ-গল্প শুনছো তাদের মধ্যে দশজনে বড়ো জোর একজন দমদমে গেছো, কাছের থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এরোপ্লেন দেখছো। বাকিরা তাহলে করবে কী? আপাতত ছবি দেখো,—খুব মন দিয়ে দেখো, দেখলেই বুঝবে এরোপ্লেনের বাইরের চেহারাটা ঠিক কী রকম।



দুই ডানার কিনারে আয়েলরন, সরু ফুটকি দিয়ে চিহ্নিত। লেজের দু পাশে এলিভেটর, মোটা ফুটকি দিয়ে ' চিহ্নিত। যে যন্ত্রটাকে কুচকুচে কালো করে আঁকা হয়েছে সেটি রাডার।

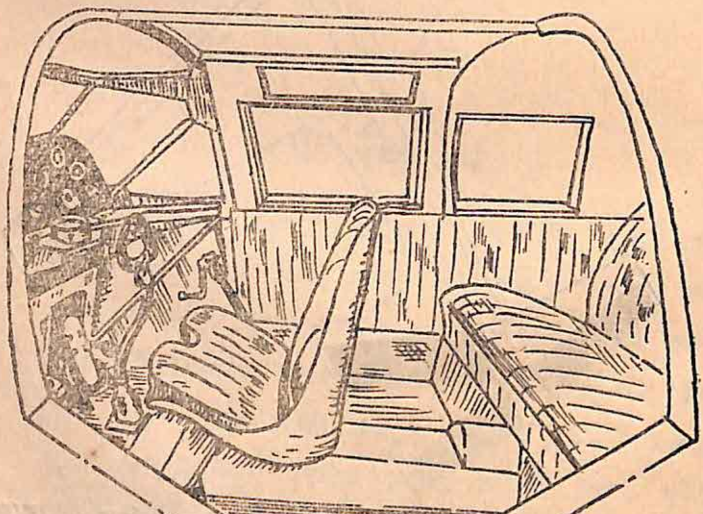
তিনটে নতুন কথা শিখে নাও।

এই তিনটি কথাকে এমনভাবে মুখস্থ করে নেবে যেন আর কখনো না ভুলে যাও। কথা তিনটি হলো :

১। আয়েলরন ২। এলিভেটর ৩। রাডার।

ছবিতে দেখো, কোনটা কোথায় থাকে। দুটো উইঙ্গ-এর পেছনের দিককার কিনার দুটোয় থাকে আ য়ে ল র ন।

এরোপ্লেনের যেটা লেজ, ইংরিজিতে যাকে বলে টেল-প্লেন, তার পেছন দিকের কিনারে ডাইনে-বাঁয়ে দুদিকে থাকে এ লি ভে ট র।

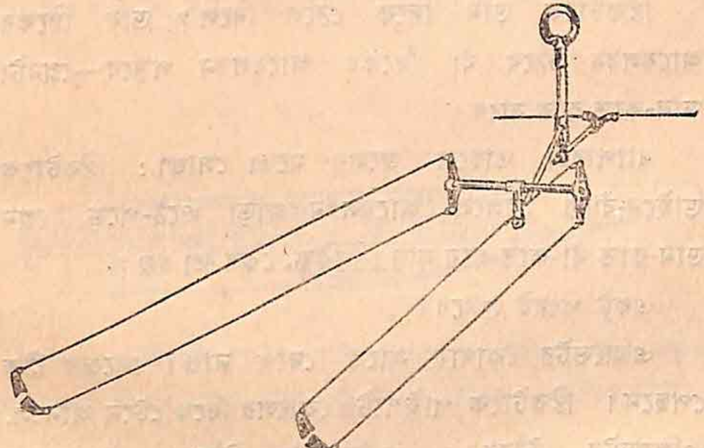


ছোট্ট এয়ারোপ্লেনের ককৃপিট

এরোপ্লেনের যেটা পাখনা, ইংরিজিতে যাকে বলে ফিন, তার সঙ্গে জোড়া থাকে রাডার, বাঙলায় যাকে বলা যায় হাল।

এরোপ্লেনের বাইরের ছবি বোঝা গেলো। এইবার ভেতরের একটা অংশের কথা বলি।

যেখানে বসে পাইলট এরোপ্লেন চালান, সেই জায়গাটা হলো এরোপ্লেনের ককপিট।



পাইলটের সামনেই যে ডাণ্ডাটা দেখছো, ওটাকে বলে কনট্রোল ষ্টিক, সংক্ষেপে ষ্টিক। ষ্টিকটাকে সামনে-পেছনে আগু-পিছু করা যায়, ডাইনে-বাঁয়ে ঘোরানো যায়। এই ষ্টিকের সঙ্গে আয়েলরন আর এলিভেটরের যোগ আছে।

ষ্টিকের ডাইনে-বাঁয়ে দু পাশে দুটো পেডাল আছে। পেডাল দুটো থেকে মোটা তার বেরিয়ে রাডারে গিয়ে মিশেছে।

এইবার দেখো, ষ্টিকের সঙ্গে আয়েলরন-এর যোগটা

কী রকম। আয়েলরন ওঠে-পড়ে। বাঁ দিকেরটা উঠলে ডান দিকেরটা পড়ে, আবার ডান দিকেরটা উঠলে বাঁ-দিকেরটা পড়ে। দুটো কখনো একসঙ্গে ওঠে না বা পড়ে না।

ষ্টিকটাকে বাঁ দিকে ঠেলে দিলে কী হবে বলতে পারো? বাঁ দিকের আয়েলরন উঠবে, ডান দিকেরটা পড়বে। তাতে কী হবে? এরোপ্লেন বাঁ দিকে কাত হয়ে যাবে।

ষ্টিকটাকে ডান দিকে ঠেলে দিলে? ডান দিকের আয়েলরন উঠবে, বাঁ দিকের আয়েলরন পড়বে—প্লেনটা ডান-কাত হয়ে যাবে।

ব্যাপারটা তাহলে জলের মতো সোজা: ষ্টিকটাকে ডাইনে-বাঁয়ে ঠেললে আয়েলরন-জোড়া ওঠে-পড়ে, প্লেন ডান-কাত বাঁ-কাত হয়ে যায়। কিন্তু, কেন তা হয়?

একটু পরেই শুনবে।

এলিভেটর কোথায় আছে দেখে নাও। লেজের ঠিক পেছনে। ষ্টিকটাকে পাইলটের কোলের দিকে টেনে আনলে, এলিভেটর উঠবে। এলিভেটর উঠলে কী হবে? প্লেনের মাথা আকাশ-মুখী উঠবে। ষ্টিকটাকে সামনে ঠেলে দিলে এলিভেটর নামবে। এলিভেটর নামলে কী হবে? প্লেনের মাথা মাটি-মুখী নামবে।

কিন্তু এমন হয় কেন?

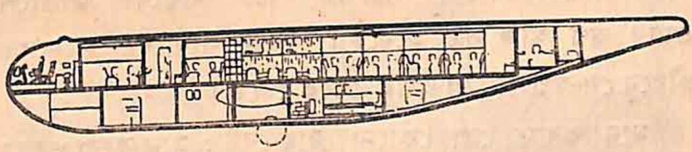
একটু পরেই শুনবে।

রাডার কোথায় আছে দেখে নাও। ফিন-এর গায়ে। রাডার ওঠা-পড়া করে না, ঘোরাফেরা করে। রাডার-এর

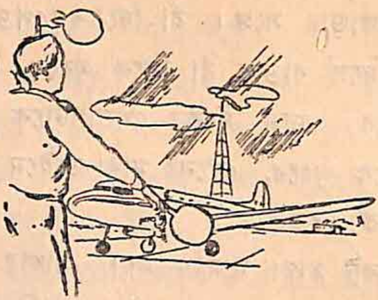
যোগ পেডাল-জোড়ার সঙ্গে। বাঁ দিকের পেডালটাকে পা দিয়ে ঠেলে দিলে রাডার বাঁ দিকে ঘুরবে, প্লেনের মাথা বাঁয়ে ঘুরে যাবে। ডান দিকের পেডালটাকে ঠেলে দিলে রাডার ডান দিকে ঘুরবে, প্লেনের মাথা ডাইনে ঘুরে যাবে।

ব্যাপারটা কী হয়?

নিজেরা একটু মাথা ঘামাও না! মাথার ঘাম পায়ে পড়বার আগেই দেখবে ব্যাপারটা বুঝে ফেলে দিয়েছো।



বাহাত্তরজন যাত্রীবাহী একটি স্ট্রাটোক্রুইসারের ক্যাবিন ব্যবস্থা : এতে ৩৬ জনের শোবার জায়গা আছে, তাছাড়া নিচে মালের গুদামটাও প্রকাণ্ড।



॥ চার ॥

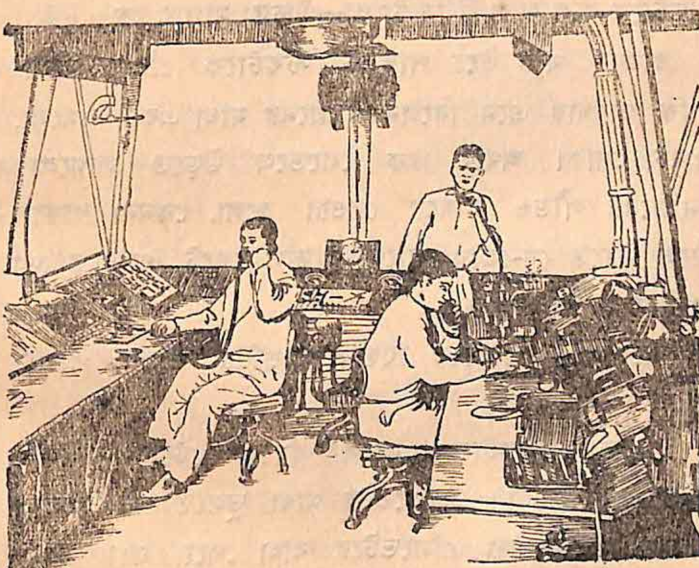
কতো দিনের কতো সাধনার পরে মানুষের আকাশে ওড়ার স্বপ্ন আজ সত্য হয়েছে। কিন্তু আমাদের অনেকের জীবনে সে-স্বপ্ন আজো স্বপ্নই থেকে গেছে।

মনে করতে তো কোনো দোষ নেই : মনে করো ওস্তাদ একজন পাইলটের সঙ্গে আমরা বেশ খাতির জমিয়ে নিয়েছি আর তিনি আমাদের সঙ্গে নিয়ে তাঁর পাশে বসিয়ে উড়তে রাজি হয়েছেন।

আমরা প্লেনের ভেতরে গিয়ে সব বড়ো-বড়ো চোখ করে উদ্‌গ্রীব হয়ে বসেছি। পাইলট এসে তাঁর ককপিটের চেয়ারে বসলেন। পেট্রল-মাপা মিটারে চোখ বুলিয়ে একবার তিনি দেখে নিলেন দরকারমতো পেট্রল আছে কি না। তারপর বোতাম টিপে দিতেই ইনজিন গর্জন করে উঠলো। আস্তে আস্তে চাকার ওপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে প্লেন এগিয়ে এসে নিশানার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো।

কীসের নিশানা? ওড়বার। নিশানা না পেলে প্লেন উঠবে না, কলকাতার রাস্তায় যেমন সবুজ বাতি না জ্বললে গাড়ি চলবে না।

নিশানা পেয়ে পাইলট স্পীড বাড়িয়ে দিলেন। যখন স্পীডোমিটারের কাঁটা চল্লিশে উঠলো, পাইলট আস্তে আস্তে স্টিকটাকে কোলের দিকে টেনে আনলেন। তখন কী হলো



এরোড্রোমের কনট্রোল টাওয়ারের ছবি। এখান থেকে বেতারে এরোপ্লেনে নির্দেশ পাঠানো হয়, সেই নির্দেশ অনুসারে একটি এরোপ্লেন উড়বে বা নামবে। আকাশে যখন অনেকগুলো এরোপ্লেন একসঙ্গে এসে পড়েছে তখন এই কন্‌ট্রোল টাওয়ার থেকে বিভিন্ন এরোপ্লেনে নির্দেশ পাঠোনো হবে : "তোমরা ততোক্ষণে এতোটা বা অতোটা উঁচুতে চক্কর দাও, তোমাদের যখন নামবার পালা হবে তখন জানাবো।"

বলো তো? এলিভেটর উঠলো, প্লেনের মাথা আকাশমুখী হলো। স্টিক কোলের দিকে টানাই আছে, প্লেনও ওপরে উঠে যাচ্ছে।

পাইলট বললেন, 'এখন আমরা হাজার ফুট উঁচুতে উঠেছি' বলে তাঁর সামনে একটা ঘড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে দিলেন। দেখলাম, ঘড়ির কাঁটা হাজারের ঘাটে এসে লেগেছে। ঘড়িটাকে বলে অ ল টি মি টা র,—উচ্চতা মাপার যন্ত্র।

হাজার ফুট উঠে পাইলট স্টিকটাকে ঠেলে মাঝামাঝি জায়গায় এনে দিলেন। প্লেনের মাথা একটু নামলো, প্লেনটা সোজা অর্থাৎ এক লেভেলে উড়তে লাগলো। ইনজিনের স্পীডও কমিয়ে দেওয়া হলো, কেননা বাতাস ঠেলে উঠতে যে-জোর লাগে বাতাস কেটে এগোতে তো আর সে-জোর লাগে না।

এতোক্ষণে আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নটার জবাব পাওয়া যেতে পারে।

পাইলট স্টিকটাকে কোলের দিকে টেনে আনলেন, এলিভেটর উঠলো। এলিভেটর মাথা তুলতে কী হলো? বাতাস মাথা-তোলা এলিভেটরে বাধা পেয়ে তার গায়ে ঝাপট মারতে লাগলো, এলিভেটরকে ঠেলে নামিয়ে দিতে চেষ্টা করলো। কিন্তু বাতাস তা পারবে কেন? স্টিক যে পেছনে টানা আছে! বাতাসের এই নুইয়ে-দেওয়া চাপটা প্লেনের লেজের ওপরে গিয়ে পড়লো, পিছনটা নিচে ঝুঁকলো, মাথা ওপরে উঠে গেলো—প্লেন উঠতে লাগলো।

কথাটা যদি এখনো খুব খটোমটো লাগে, ছেলেবেলার সী-স খেলার কথাটা একবার মনে করে দেখো। কিংবা দাঁড়িপাল্লার কথাটা ভেবে দেখো। ডান দিকের পাল্লায় ওজন বেশি হলে দাঁড়িটার এ-মাথাটা নেমে গিয়ে ও-মাথাটা যেমন উঠে যায়, ঠিক তেমনি প্লেনের পিছনটা নুয়ে পড়লে মাথাটা উঠে যায়,—গোটা প্লেনটাই উঠে যায়।

প্লেন সমতলে উড়ছিল। পাইলট স্টিকটাকে বাঁ দিকে ঠেলে দিলেন, বাঁ দিকের পেডালটাকে পা দিয়ে সামনে ঠেলে দিলেন। কী হলো? বাঁ দিকের আয়েলরন উঠলো, ডান দিকের আয়েলরন পড়লো। আর কী হলো? রাডারটা বাঁ দিকে ঘুরে গেলো।

এই দুটি জিনিস হওয়ার ফলে প্লেনটা বাঁ দিকে কাত হয়ে ঘুরে গেলো।

এতোক্ষণে আমাদের প্রথম আর তৃতীয় প্রশ্নটার জবাব পাওয়া যেতে পারে।

বাঁ দিকের আয়েলরন যখন উঠলো তখন ওপরকার বাতাস তাতে বাধা পেয়ে বাঁ দিকের উইঙ্গকে ঠেলে নামাতে চাইলো। ডান দিকের আয়েলরন যখন নামলো তখন নিচেকার বাতাস তাতে বাধা পেয়ে ডান দিকের উইঙ্গকে ঠেলে তুলতে চাইলো। কিন্তু বাতাস তা পারবে কেন? স্টিক যে বাঁয়ে ঠেলা! তাহলে হবে কী? বাতাসের চাপে প্লেন বাঁ দিকে কাত হয়ে পড়বে।

রাডারটাকে বাঁয়ে ঘুরিয়ে দেওয়াতে বাতাস তার ওপর

এসে ঝাপটাতে লাগলো, তাকে ডান দিকে ঘোরাতে চাইলো। বাতাসের চাপে প্লেনের লেজ ডাইনে ঘোরাতেই প্লেনের মাথা বাঁ দিকে নুয়ে পড়লো—সেই দাঁড়িপাল্লার ব্যাপার।

প্লেনের মাথাটাকে বাঁ দিকে ঘোরালো আসলে রাডার। শুধু পেডাল ঠেললেই তো তা হতো, স্টিকটাকে বাঁ দিকে ঠেলার দরকার কী ছিলো? আমাদের মনের এই প্রশ্নটা পাইলট যেন আমাদের মুখ দেখেই ধরে ফেললেন। বললেন, 'বাঁয়ের উইঙ্গটাকে বাঁ-কাত না করে নিয়েই যদি মাথাটাকে ঘোরাতাম, প্লেনটা গোঁত্তা খেয়ে ঘুরপাক খেতো।

'তাই ডাইনে-বাঁয়ে ঘোরাতে হলে একসঙ্গে স্টিক আর পেডাল দুটোকেই ব্যবহার করতে হয়।'

কথা বলতে বলতে পাইলট স্টিকটাকে ডান দিকে আর ডান দিকের পেডালটাকে ঠেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্লেন আবার সোজা হয়ে আসতে লাগলো। পুরোপুরি সোজা হতেই স্টিক চলে এলো মাঝখানে, রাডারও তাই।

পাইলট বললেন, 'সাঁতারের ডাইভ দেখেছো, এইবার দেখো প্লেনের ডাইভ। ভয় পেও না কিন্তু!' স্টিক চলে গেলো সামনে। দেখতে-দেখতে প্লেনের মাথা গোঁত-খাওয়া ঘুড়ির মতো মাটিমুখী নামতে লাগলো, স্পীডোমিটারে চেয়ে দেখলাম, কাঁটা তরতর করে সরে যাচ্ছে ১৩০, ১৪০, ১৫০, ১৬০।

ভয়ে তো আমাদের সকলের বুক দুরুদুরু।

'আচ্ছা, আর নয়' বলে পাইলট আস্তে আস্তে ষ্টিকটাকে কোলের দিকে টেনে নিলেন। প্লেনের মাথা আস্তে আস্তে

উঠে এলো। পাইলট তখন ষ্টিকটাকে আস্তে আস্তে ঠেলে মাঝামাঝি জায়গায় রাখলেন—প্লেন এক লেভেলে অর্থাৎ সোজা উঠতে লাগলো।

ব্যাপারটা কী হলো ?

জলের মতো সোজা। ষ্টিকটাকে সামনে ঠেলে দিতেই এলিভেটর নুয়ে পড়লো, বাতাস নুয়ে-পড়া এলিভেটরে ধাক্কা দিয়ে তাকে ঠেলে তুলতে চেষ্টা করতে লাগলো আর সেই ধাক্কায় প্লেনের মাথা মাটিমুখী হলো ; পৃথিবীর মহাকর্ষের টানে প্লেন তীরবেগে নিচে নামতে লাগলো। তারপর ষ্টিকটাকে আস্তে আস্তে কোলের দিকে টানতেই এলিভেটর উঠে গেলো, প্লেনের মাথাও উঠে এলো।

পাইলট বললেন, 'আরো এক রকমের ডাইভ আছে। এই দেখো, ইনজিনের বোতাম বন্ধ করে দিলাম। ইনজিন চলছে বটে, কিন্তু এতো আস্তে যে তা না-চলারই সামিল—'

কাঁটা আবার তরতরিয়ে নিচের ঘাটে নামতে শুরু করলো : ১১০—১০০—৯০—৮০—৭০—৬০। চল্লিশের ঘাট ছাড়াতেই প্লেনটা হঠাৎ এক ঝাঁকুনি দিয়ে মাটিমুখী হয়ে নামতে লাগলো।

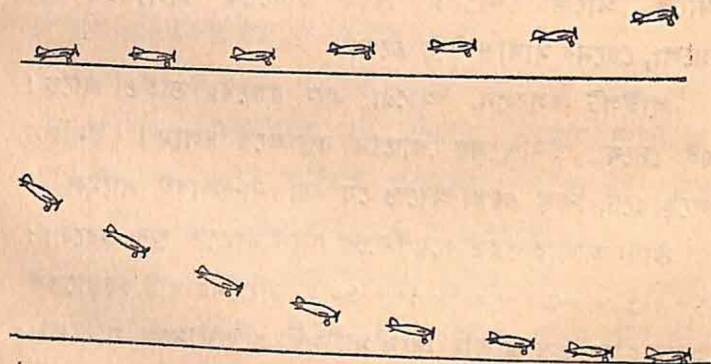
এই রকম হলে বলা হয় প্লেন 'স্টল্ড' হয়ে গেছে। 'স্টল্ড' হলে প্লেন আর পাইলটের বশে থাকে না, ষ্টিক-পেডাল সব অকেজো হয়ে পড়ে। পাইলটকে অপেক্ষা করতে হয়—নামার বেগের ঝোঁকে প্লেনের স্পীড কতোক্ষণে আবার চল্লিশ ছাড়ায়।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, পাঁচ-দশ সেকেণ্ড মাত্র।

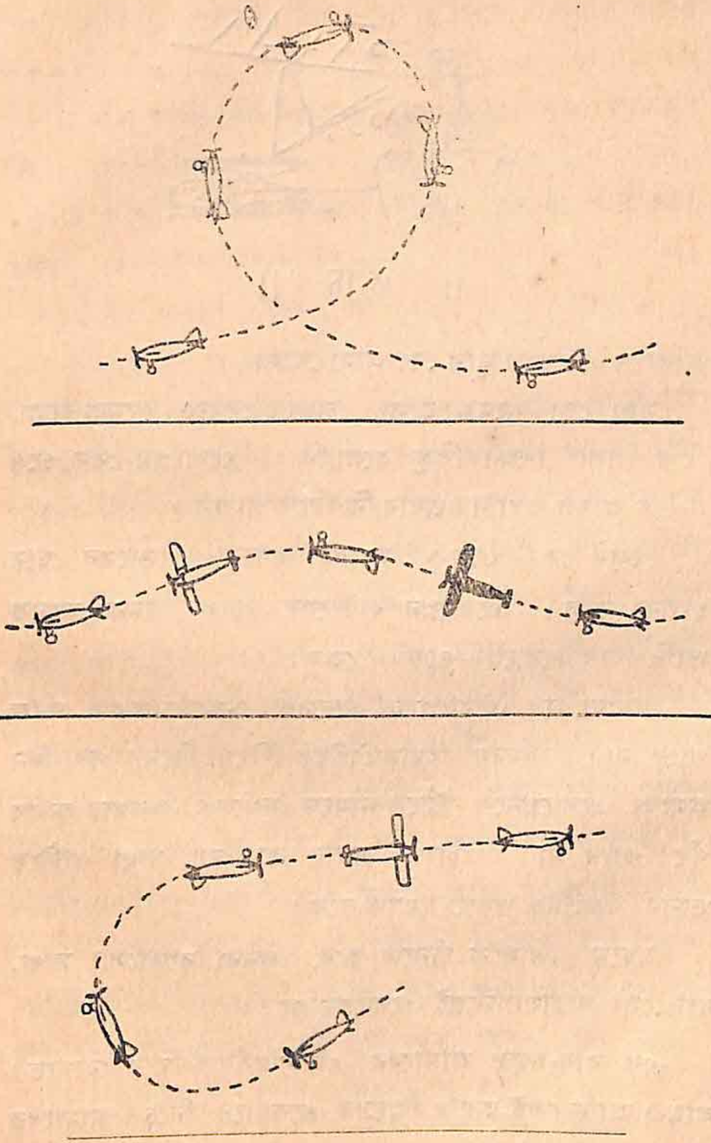
স্পীড চল্লিশ ছাড়ালো, প্লেন মাথা তুললো, আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

পাইলট বললেন, 'আজ এই পর্যন্ত। চলো এখন নামিয়ে দিয়ে আসি। সার্কাসের মতো আমাদের প্লেনেরও বহুত খেল আছে। আজ তিনটে খেল তোমাদের দেখাবো—লুপ, ফ্লিক রোল, হাফ রোল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখো।'

আমরা বড়ো বড়ো চোখ মেলে দেখতে লাগলাম—



উপরে টেক্‌-অফ, নিচে ল্যাণ্ডিং—অর্থাৎ মাটি ছেড়ে ওড়া আর মাটিতে নামা



উপরে লুপ, মাঝে ফ্লিক্ রোল, তলায় হাফ রোল



।। পাঁচ ।।

আকাশে এক চক্কর ঘুরে তো আসা গেলো।

মজা তো অনেক হলো, চোখের দেখাও অনেক হলো, কিন্তু আসল শিক্ষা কিছু হলো কি? এরোপ্লেন কেন ওড়ে —এই আসল কথাটার জবাব কি দিতে পারবে?

বেলুন কেন ওড়ে? জবাবটা জানো—বাতাসের চেয়ে হালকা বলে। এরোপ্লেন বাতাসের চেয়ে অনেক অনেক ভারি—তবু এরোপ্লেন ওড়ে। কেন?

অসংখ্য বার এরোপ্লেনে চড়লেও এ-কথার জবাব খুঁজে পাবে না। দমদম বিমানঘাঁটিতে গিয়ে দিনের পর দিন অসংখ্য এরোপ্লেনকে উঠতে-নামতে দেখলেও এ-কথার জবাব খুঁজে পাবে না। চোখে দেখার কাজ নয়, মাথা খাটিয়ে ওড়ার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে বুঝতে হবে।

প্রথমে বাতাসকে চিনতে হবে, কেননা বাতাসের মধ্যে, বাতাসের সাহায্য নিয়েই এরোপ্লেন ওড়ে।

এক বায়ু-সমুদ্র আমাদের এই পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে। আমরা আছি সেই অগাধ সমুদ্রের একেবারে নিচে—আমাদের

মাথা ছাড়িয়ে, পৃথিবীর ওপর-পিঠ ছাড়িয়ে, এ-সমুদ্র অনেক দূর পর্যন্ত—প্রায় ৬২০ মাইল পর্যন্ত—উঠে গেছে।

আসলে গ্যাস হলে কী হয়, বায়ুমণ্ডলের ওজন আছে। নিচের দিকের বায়ুমণ্ডল ভারি ; সেখানে তার চাপ বেশি। তারপর যতোই ওপরে উঠেছে ততোই পাতলা হতে হতে গেছে ; সেখানে তার চাপ কম।

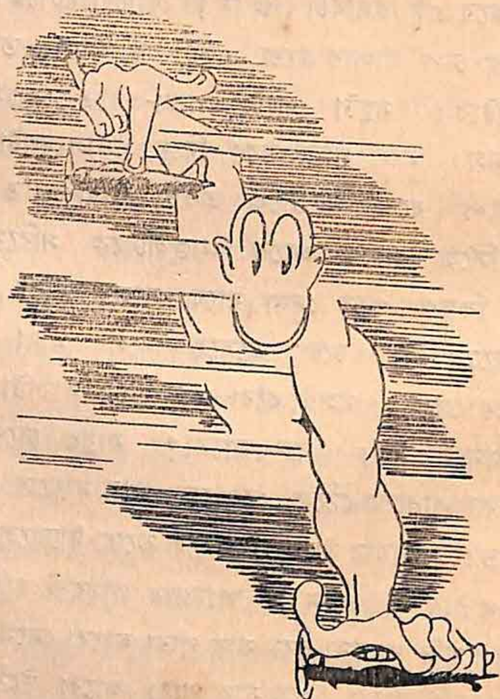
সমুদ্রের ওপরে বায়ুমণ্ডলের চাপ ৭৬০ মিলিমিটার।

কী করে এই হিসাবটা পেলাম ? ব্যারোমিটারে।

বায়ুর চাপ মাপার জন্যে একটা যন্ত্র আছে, তারই নাম ব্যারোমিটার। যন্ত্রটা একটা পারা-ভরতি একমুখখোলা কাচের নল। নলে পারা ভরে দিয়ে, খোলামুখটা আঙুল দিয়ে চেপে ধরে নলটাকে একটা পারা-ভরতি পাত্রের মধ্যে বসিয়ে, আস্তে আস্তে আঙুলটাকে সরিয়ে নিতে হবে। কিছুক্ষণ পরে দেখা যাবে, নলের পারা খানিকটা নেমে পাত্রের মধ্যে চলে এসেছে—নলের মাথা খানিকটা খালি হয়ে গেছে। নলটা ধরো ৩৬" উঁচু—পারাটা ৬" নেমে আর নামলো না। কেন জানো? বায়ুর চাপে পাত্রের পারা নলের পারাকে ঠেলে রেখেছে, আর নামতে দিচ্ছে না। নলের ভেতরে পারার উচ্চতা তাহলে কতো দাঁড়ালো ? ৩০"। ঐ ৩০" পারার যা ওজন ঐ জায়গায় বায়ুরও তাই ওজন। বায়ুর চাপ যদি কখনো কমে যায় পারা আরো নেমে আসবে। আর চাপ যদি আরো বেড়ে যায় পারা আরো উঠে যাবে—বায়ুর চাপ পাত্রের পারাকে ঠেলে তুলে দেবে।

সমুদ্রের ওপরে বায়ুর ওজন প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে প্রায় ৭ঃ সের কিন্তু গৌরীশৃঙ্গের যে-চূড়ায় তেনজিঙ গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সেখানে বায়ু ভীষণ পাতলা আর হালকা ; সে বায়ুস্তরে অক্সিজেন এতো কম যে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

সমুদ্রের ওপর থেকে ১০ মাইল ওপরে ওঠো, দেখবে বাতাসের চাপ কমে হয়েছে ৮২·৬ মিলিমিটার। আরো ৩ মাইল ওপরে, অর্থাৎ ৭০ হাজার ফুট উঁচুতে ওঠো, সেখানকার



যতো উঁচুতে উঠবো ততোই হাওয়ার চাপ কমবে

চাপ ৩০·১ মিলিমিটার। ১১৭ হাজার ফুট উঁচুতে ৩·৬ মি. মি, ১,২৭,৭০০ ফুট উঁচুতে ২·৩ মি. মি.।

অতো উঁচু-উঁচু জায়গার এতো সব হিসেব পাওয়া গেলো কী করে? অতো উঁচুতে তো মানুষ থাকে না যে ব্যারোমিটার বসিয়ে হিসেব কসবে। সেখানে হিসেব নেওয়া হয় বেলুন উড়িয়ে। এই বেলুনকে বলে পাইলট বেলুন। এই চাপ-মাপার কাজে আজকাল রকেটেরও ব্যবহার হচ্ছে। রকেট কী তা একটু পরে শুনবে।

কিন্তু মজাটা দেখলে তো। মাত্র ২৪ মাইলের ব্যবধানে বাতাসের চাপ ৭৬০ মি মি. থেকে নেমে গেল ২·৩ মি. মি.-এ।

কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় বাতাসের চাপ সব সময়েই এক থাকে না—কমে-বাড়ে। সেই জায়গায় তাপ বাড়লে চাপ কমে, তাপ কমলে চাপ বাড়ে।

যারা এরোপ্লেন চালাবে, বাতাসের এই লঘুতা-ঘনতার কথা, বাতাসের চাপের কমি-বেশির কথা, তাদের ভাবতে হবে। কেননা, হালকা বাতাসের মধ্য দিয়ে প্লেন চালানো অনেক সহজ; ঘন বাতাসের মধ্য দিয়ে প্লেন চালানো ততো সহজ নয়—সেখানে বাতাস প্লেনকে বাধা দেয় বেশি। হালকা বাতাসে প্লেন যে-বেগে উড়তে পারে ঘন বাতাসে সেই বেগে উড়তে পারে না।

তাপ বাড়লে সেই জায়গার বাতাসও গরম হয়। গরম বাতাস প্রসারিত হয়ে ওপরে উঠে যায়। উঠতে উঠতে সে তাপ হারায়, তাপ হারাতে ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

কিছুটা বাতাস সেই উত্তপ্ত জায়গা থেকে সরে যাওয়ার ফলে সেই জায়গার বাতাসের চাপ কমে যায়—সেখানে একটা কম-চাপের এলাকা তৈরি হয়।

যে-বাতাস ওপরে উঠে গেলো সেগুলো কোথায় গেলো? ওপরে উঠতে উঠতে ঠাণ্ডা আর ঘন হয়ে সেগুলো দু পাশের ঠাণ্ডা আর ঘন বাতাসের স্তরে গিয়ে মেশে। সেইসব ঠাণ্ডা-ঘন স্তরে তখন বাতাসের চাপ বাড়ে, সেখানে একটা বেশি-চাপের এলাকা তৈরি হয়। এইভাবে তাপের বাড়া-কমায় চাপ কমে-বাড়ে।

বাতাস তাই সর্বদাই অস্থির, সর্বদাই চঞ্চল। বাতাসে ওঠা-নামার প্রবাহ চলছে—বাতাসের স্রোত সর্বদাই বইছে। এ স্রোত কখনো দ্রুত, কখনো মন্থর। বাতাসের এই স্রোতের ঝোঁকটা হলো ওপর থেকে নিচের দিকে: সর্বদাই তার চেষ্টা—বেশি-চাপের এলাকা ছেড়ে কম-চাপের এলাকায় নেমে আসি।

পৃথিবীকে-ঘিরে-থাকা এই বায়ুমণ্ডল, সারাদিন-ধরে-পৃথিবীতে-তাপ বর্ষণ করা সূর্য, আর পৃথিবীর জল আর মাটি—এই তিন জিনিস মিলে তৈরি হয় আবহাওয়া। বাতাসের নানামুখী স্রোত, মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়—এই তিন জিনিসের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল। ওস্তাদ পাইলট হতে হলে এই আবহাওয়াকে চিনতে হবে, মেঘের রূপ দেখে আবহাওয়ার পূর্বাভাস বুঝতে শিখতে হবে, তবেই নিরাপদে প্লেনকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

পৃথিবীর তিন ভাগের দু ভাগ জল। পৃথিবীর ওপর-পিঠের এই বিস্তৃত জলভাগের ওপর সমস্ত দিন ধরে সূর্যের আলো পড়ে—সূর্যের প্রখর তাপে সে জলভাগ উত্তপ্ত হয়ে যায়।

জল তরল পদার্থ। কিন্তু তাপ পেয়ে পেয়ে সেই জল যখন টগবগিয়ে ফুটতে থাকে তখন জল বাষ্পীয় গ্যাসের আকার ধারণ করে। সেই বাষ্প বাতাসে গিয়ে মেশে। জলের এই বাষ্প হয়ে যাওয়াকে বলে বা ষ্পী ভ ব ন।

ঠাণ্ডা বাতাসের চেয়ে গরম বাতাসের বাষ্পধারণ করবার ক্ষমতা বেশি। বাতাস যতোই গরম হয়, তার বাষ্পধারণের ক্ষমতা ততোই বাড়ে। বাতাসের এই বাষ্পমিশ্রিত অবস্থার নাম আ র্দ্র তা।

তপ্ত, লঘু, বাষ্পীয় বাতাস ওপরের দিকে উঠে যায়। ওপর-আকাশে তাপ কম, সেই কম তাপে বাতাসের বাষ্প ঘন হয়ে যায়,—সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম জলকণা বা তুষারকণায় পরিণত হয়। সেই ঘনীভূত জলকণা বা তুষারকণা আকাশে মেঘ বা কুয়াশা হয়ে ভাসতে থাকে।



॥ ছয় ॥

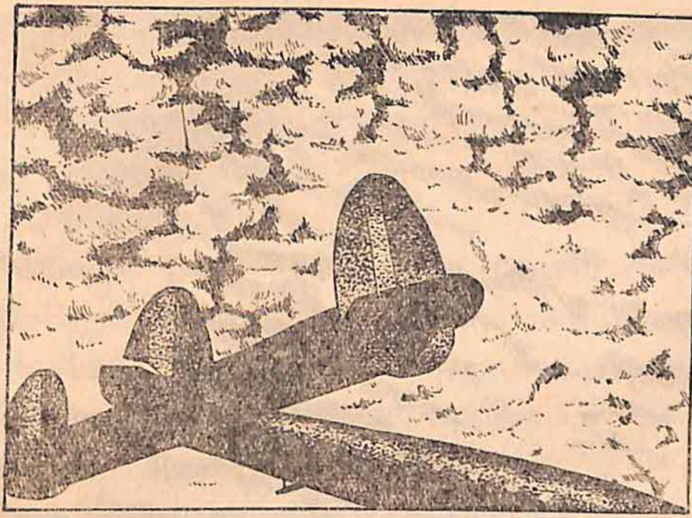
আকাশে মেঘ জমে, ঝড় ওঠে, বৃষ্টি নামে।

সব সময়েই কি ঝড় ওঠে? সব মেঘেই কি বৃষ্টি নামে? না।

মেঘ এক রকমের নয়। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে কোনো দিন যদি একনাগাড়ে কিছুক্ষণ আকাশে তাকিয়ে থাকো, মেঘের বৈচিত্র্য দেখে মুগ্ধ হতে হবে।

আবহাওয়া নিয়ে আলোচনা করে যে-বিজ্ঞান তাকে বলে আবহ-বিজ্ঞান। আবহবিজ্ঞানে মেঘকে চারটে মূল শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে: ১। সিরাস Cirrus ২। কিউমিউলাস Cumulus ৩। স্ট্র্যাটাস Stratus ৪। নিম্বাস Nimbus.

সিরাস হলো উঁচু-আকাশের মেঘ—৩৫ হাজার ফুট থেকে ২০ হাজার ফুটের মধ্যে তার গতিবিধি। দেখতে কেমন? সাধারণত শাদা, ছেঁড়া-ছেঁড়া, পেঁজা তুলোর মতো, হালকা পালকের মতো। এই মেঘে ছায়া হয় না,

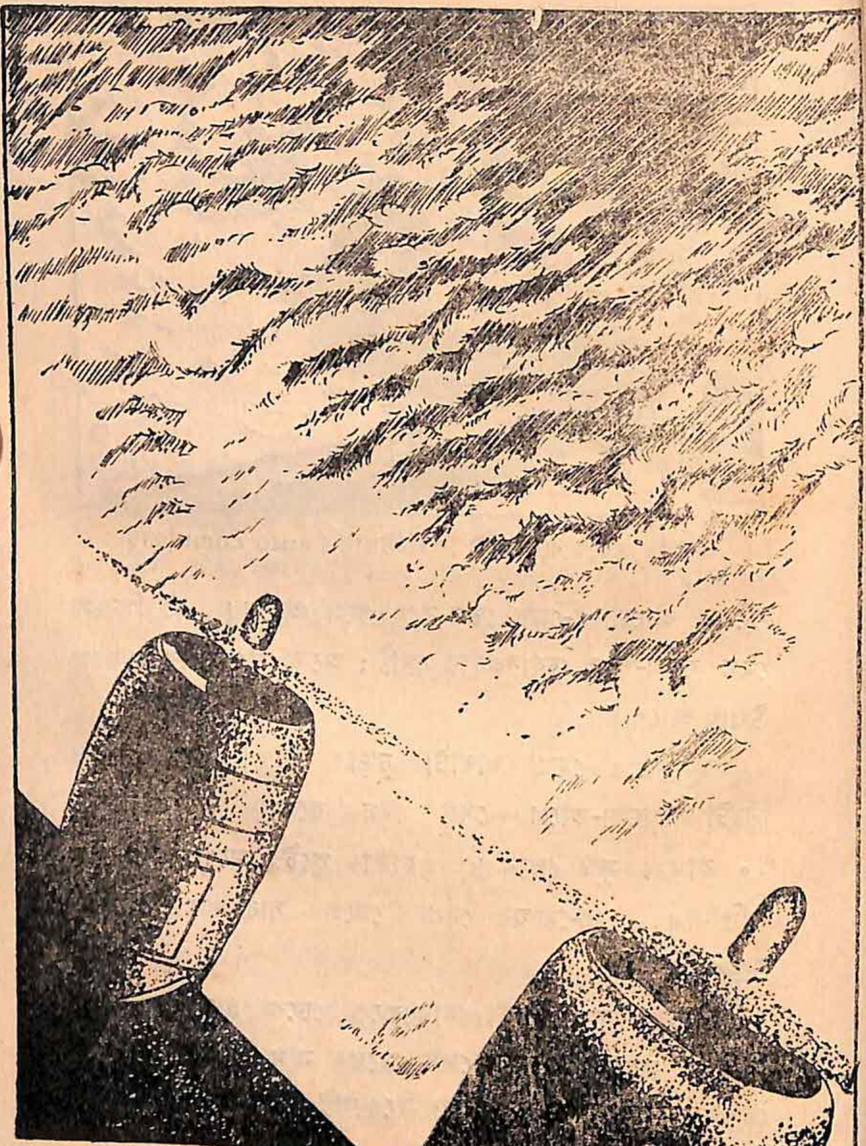


এ-রকম মেঘকে বলে অটো-কিউমিউলাস (auto cumulus)

সূর্যের আলো এ-মেঘ ভেদ করে চলে আসে। এই সিরাস মেঘ সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম তুষারকণার সমষ্টি ; অতো ঠাণ্ডায় তা না হয়ে উপায় আছে ?

স্তূপ-স্তূপ মেঘ, মাথাটা চূড়ার মতো উঠে গেছে, নিচটা কালো-কালো—সেই মেঘ হলো কিউমিউলাস। ২০ হাজার ফুট থেকে ৬½ হাজার ফুটের মধ্যে এ-মেঘের গতিবিধি। এ-মেঘের দেখা মেলে সাধারণত গ্রীষ্মের উত্তপ্ত দিনে।

নিচের দিকে গোটা আকাশকে ঢেকে চাদরের মতো বিছিয়ে থাকে যে-মেঘ, সেই মেঘের নাম ষ্ট্র্যাটাস। এই মেঘ দেখলেই বুঝতে হবে ঝিরঝিরে বৃষ্টি হবে।



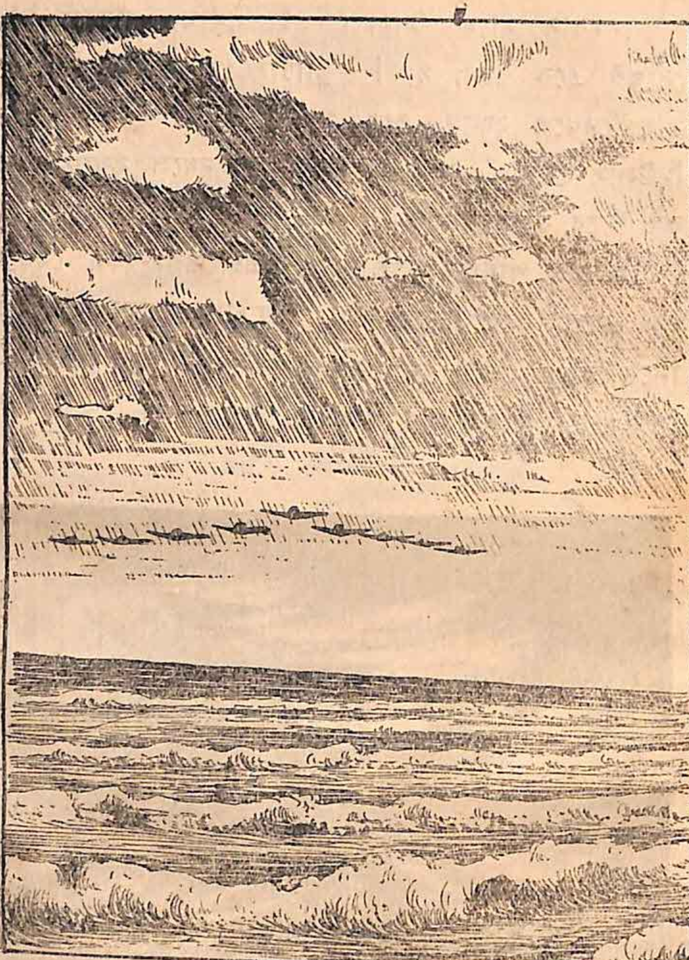
৪৬ সিরো-কিউমিউলাস (cirro-cumulus) মেঘ।

নিমবাস মানে 'মাথা'। এই মেঘের গাঢ়কৃষ্ণ মাথা দেখেই একে চেনা যায়। ষ্ট্র্যাটাস মেঘের ওপর কালো মাথা দেখলে বুঝতে হবে, মুষলধারে বৃষ্টি হবে। কিউ-মিউলাস মেঘের ওপর কালো মাথা দেখলে বুঝতে হবে ঝড় উঠবে, বজ্রপাত হবে।

অভিজ্ঞ পাইলট হতে হলে এই রকম-রকম মেঘকে খুব ভালো করে চিনতে হয়, প্রত্যেকের চালচলনকে বুঝে নিতে হয়। কোন মেঘে ঝড় উঠবে, কোন মেঘে বৃষ্টি নামবে সেটা চোখে দেখেই আন্দাজ করতে শিখতে হয়।



সিরাস্ (cirrus) মেঘ।



কিউমিউলাস মেঘ কিন্তু চমৎকার আবহাওয়া।

আকাশে নানা শ্রেণীর মেঘ অনেক সময়েই মেশামিশি করে থাকে। সিরাস মেঘের সঙ্গে কিউমিউলাস মিশে থাকে,

তখন তার নাম সিরোকিউলাস। এই রকম সিরো-স্ট্র্যাটাস সিরাস আর স্ট্র্যাটাস মেঘের মিলন। এই সিরো-স্ট্র্যাটাস মেঘের ভিতর দিয়ে সূর্যের দিকে তাকালে কখনো কখনো দেখা যায়, সূর্যের চারপাশে একটা জ্যোতিশ্চক্র তৈরি হয়েছে। আকাশের অনেকটা জুড়ে বড়ো-বড়ো থোবা মেঘ, সেই হলো অলটো-কিউমিউলাস।

পাইলটকে কুয়াশার কথাও জানতে হবে। নানা কারণে কুয়াশা জমে। ধরো, লম্বালম্বি এক পথ ধরে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। সেই বাতাসের স্রোতের তাপ যদি কমে যায়, তাহলে কুয়াশা হবে। কিংবা ধরো, বাষ্পহীন, শুকনো, ঠাণ্ডা বাতাস গরম বাতাসের সংস্পর্শে এসে বাষ্পে ভরে গেছে; তখন কুয়াশা হবে। তেমনি আবার, গরম বাষ্পপূর্ণ বাতাস যদি ঠাণ্ডা জায়গার ওপর দিয়ে বয়ে যেতে থাকে, তাহলে কুয়াশা জমবে। নদীর ওপরে, জলাজমির ওপরে, পাহাড়ের উপত্যকায় যে-কুয়াশা জমে, তাকে বলে তাপ-বিকীর্ণ কুয়াশা—গরম বাতাসের বাষ্পকণা রাত্রিতে ঠাণ্ডা হয়ে ভাসতে থাকে। সূর্য উঠলেই এ কুয়াশা মিলিয়ে যায়।

আগেই শুনেছো, তপ্ত বাতাস প্রসারিত হয়ে উঠে যায় আর ঠাণ্ডা বাতাস ঘন হয়ে নেমে আসে। এই ওঠানামাতেই বাতাসের চলাচল সৃষ্টি হয়। উঠতি আর পড়তি এই দুই বাতাস যেখানে এ ওর মুখোমুখি হয়, তাকে বলে বাতাসের ফ্রন্ট। যে-জায়গা থেকে ঠাণ্ডা বাতাস সরে যাচ্ছে আর গরম বাতাস এসে সেই জায়গা দখল করছে, সেই জায়গাকে

বলে তপ্ত ফ্রন্ট। আর, যে-জায়গা থেকে গরম বাতাস হটে যাচ্ছে আর ঠাণ্ডা বাতাস এসে সেই জায়গা দখল করছে, সেই জায়গাকে বলে শীতল ফ্রন্ট। মেঘ দেখে অভিজ্ঞ পাইলট বলে দিতে পারেন কোথায় কখন কোন্ ফ্রন্ট তৈরি হবে।

পাইলট দেখলেন, আকাশে সিরাস মেঘ ছিলো, সেখানে ক্রমে ক্রমে সিরো-ষ্ট্র্যাটাস, অলটো-ষ্ট্র্যাটাস, নিমবো-ষ্ট্র্যাটাস মেঘ জমে উঠলো। পাইলট বুঝবেন, সেখানে তপ্ত ফ্রন্ট সৃষ্টি হবে—তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমবে, খানিক পরেই মুষলধারে বৃষ্টি নামবে। সুতরাং, সাবধান।

আবার তিনি হয়তো দেখলেন, অলটো-ষ্ট্র্যাটাস বা অলটো-কিউমিউলাস মেঘ বদলে হচ্ছে কিউমিলো-নিমবাস। শীতল ফ্রন্টের সংকেত পাওয়া গেলো। তাপমাত্রা চকিতে কমে যাবে, ঝড় উঠবে। সাবধান।

এইভাবে মেঘের গতিবিধি দেখে আসন্ন ঝড়-বৃষ্টির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পাকা পাইলট হতে হলে সে-ইঙ্গিতকে চিনতে শিখতে হবে।

॥ সাত ॥



লেঅনার্দো দা-ভিঞ্চি বলেছিলেন, বাতাস চলমান পদার্থের গতিরোধ করে। যারা কখনো বাতাসের মুখে সাইকেল চালিয়েছো কিংবা খুব জোরে দৌড়েছো তারাই বুঝবে কথাটা কী সত্যি। বাতাসের এই বাধা-দেওয়া, এই গতিরোধ-করা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ আজ বাতাসের চেয়ে ভারি জিনিসকেও উপরে তুলতে শিখেছে।

বাতাসের এই যে শক্তিটার কথা বললাম, এটা আসে লম্বালম্বি ভাবে—গতিশীল পদার্থের সঙ্গে এক লাইন ধরে। কিন্তু বাতাস আর একটা চাপ দেয়। সেই চাপটা পড়ে আড়াআড়ি ভাবে—গতিশীল পদার্থের চলার লাইনের উপর-নিচ পথ ধরে। ৪০নং পৃষ্ঠার ছবিটা আবার দেখো।

খটোমটো লাগছে? ভালো বোঝা যাচ্ছে না?

আমাদের দেশে চৈত্র-বৈশাখ মাসের ঝড়ে ঘরের টিনের চাল উড়ে যায়। কেন উড়ে যায়? কী হয়? ঝোড়ো বাতাস হু-হু করে ছুটে আসতে-আসতে ঘরটার গায়ে এসে ধাক্কা খায়। ধাক্কা খেয়ে? উপর দিকে উঠে, প্রতিবাত দিকে চলে যায়। প্রতিবাত দিক কোন দিকটাকে বলে? যে-দিক থেকে বাত বা বাতাস আসছে তার উলটো দিকটা হলো প্রতিবাত দিক। উঠে, প্রতিবাত দিকে চলে যেতে-যেতে বাতাস চালের বাতাসমুখী অংশটার উপর চাপ দেয় আর বাতাস-প্রতিমুখী অংশটাকে জোর টান দেয়। তার মানে, বাতাস চালের এক দিককে চাপছে আর তার উলটো দিককে টানছে। এক মুখে চাপ, অন্য মুখে টান। এই চাপ আর টানের শক্তিতে চাল উড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

একটা পরীক্ষা করে নেবে? তাহলে কথাটা একেবারে জলের মতো সোজা হয়ে যাবে।

ডন দেবার ভঙ্গিতে হাত আর পা জোড়া মেজের সঙ্গে ঠেকিয়ে রাখো। তারপর হাতজোড়া দিয়ে মেঝের ওপর খুব জোর চাপ দাও আর পাজোড়াকে তুলে দিতে চেষ্টা করো।

পাজোড়া উঠে গেলো না? ঝোড়ো বাতাসও ঠিক এইভাবেই টিনের চালকে উড়িয়ে নিয়ে যায়।

ইংল্যাণ্ডে জর্জ কেলী নামে একজন পণ্ডিত জন্মেছিলেন। তিনি বাতাসের এই চাপ-আর-টানের শক্তিটাকে বেশ ভালো করে বুঝেছিলেন, আর বুঝে তাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছিলেন।

কেলী আরেকটা খুব দরকারি কথাও বললেন। তিনি বললেন, বাতাসের চেয়ে ভারি যে-যন্ত্রটাকে আকাশে তুলতে চাইছি, সে-যন্ত্রের পাখির ডানার মতো একজোড়া ডানা বা উইঙ্গ চাই। ডানাই হলো ওড়ার যন্ত্রের সেই অংশ যার ওপর বাতাসের চাপ আর টানের শক্তি এসে পড়বে। ডানাই এরোপ্লেনকে ওপরে তুলে দেয়।

এরোপ্লেন যখন ওড়ে তখন বাতাস উইঙ্গ-এর ওপর-নিচ দু পিঠের ওপর দিয়েই বয়ে যায়। ওপর পিঠ দিয়ে বাতাস খুব জোরে বয়ে যায়—সেখানে কম চাপের সৃষ্টি হয়। নিচের পিঠ দিয়ে বাতাস অতো জোরে বয় না—সেখানে বেশি চাপের সৃষ্টি হয়। ওপর-পিঠ উইঙ্গকে টানতে থাকে, নিচের পিঠ উইঙ্গকে ঠেলতে থাকে। এই দুই ক্রিয়ার মিলিত ফলে ডানা বা উইঙ্গ উঠে যায়।

এই ডানা বা উইঙ্গ-এর আকারটা কেমন হওয়া উচিত?

জর্জ কেলী এই কথাটারও জবাব বার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ডানার ওপর-পিঠটা সমতল না হয়ে যদি একটু বাঁকানো বা দোমড়ানো হয় তাহলে সেই ডানা অনেক

বেশি কাজের হয়। বাতাস সমতল পিঠের ওপর দিয়ে যে-বেগে যায়, বাঁকানো পিঠের ওপর দিয়ে তার চেয়েও বেশি বেগে যায়।

কথায় কাজ কী? নিজের হাতে পরীক্ষা করে কথাটার সত্যি-মিথ্যে বুঝে নাও।

এক টুকরো শক্ত কাগজ জোগাড় করো। কাগজটাকে ঠোঁটের নিচে ধরে ফুঁ দাও। এইবার ঐ কাগজটার ওপর-পিঠটাকে একটু বাঁকিয়ে নিয়ে, ঠোঁটের নিচে ধরে ফুঁ দাও। কাগজটা উঠে যাচ্ছে না? ওপর দিকে ফুঁ দিচ্ছো, তবু কাগজটা ওপর দিকে উঠছে। কেন বলো তো? বাতাসের চাপ নিচের পিঠে বেশি, ওপর-পিঠে কম। কাগজ তাই উঠছে।

কেলী এই নিয়মটা অনুসরণ করে গ্লাইডার তৈরি করে আকাশে উঠলেন। ১৪ পৃষ্ঠায় তাঁর যন্ত্রের ছবিটা দেখছো।

লে ব্রি নামে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ছিলেন জাহাজের ক্যাপ্‌টেন। দক্ষিণ সমুদ্রে অ্যাল্‌ব্‌স্ট্রস্‌ নামে এক পাখি খুব উঁচুতে ওঠে। কিন্তু ওড়ার সময় তাদের পাখা নড়ছে না বলে মনে হয়।

লে ব্রি ঐ পাখির ডানার গড়ন পরীক্ষা করার জন্যে একটা পাখি মারেন। ১৮৫৫ সালে তিনি খুব যত্ন করে কাপড়ে-মোড়া এক পাখা বানান, তার বিস্তার ২৩ ফুট। এক ঘোড়ার গাড়ির চাকার সঙ্গে ঐ পাখাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিলেন। কোচোয়ানের চাবুক পিঠে পড়তেই ঘোড়া

ছুট দিল, আর লে ব্রিকে নিয়ে তাঁর গ্লাইডার সোঁ করে ৩০০ ফুট উঠে গেলো, আর ২০০ ফুট ওপর দিয়ে উড়তে লাগলো।

মানুষের আকাশ-জয় যে আসন্ন, এই সব ঘটনা তারই ইঙ্গিত। কিন্তু এ-জয় হঠাৎ একদিনে সম্ভব হয় নি।

মানুষের আকাশ-জয়ের অভিযানে লিলিয়েনথাল চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। লিলিয়েনথাল ছিলেন জার্মান। তিনি একজন ওস্তাদ কারিগর ছিলেন। তিনি যখনি যে-তত্ত্ব উত্থাপন করতেন, সেই তত্ত্বের প্রমাণে সঙ্গে সঙ্গে মেশিন তৈরি করে দেখাতেন। তিনি পাখিদের ওড়া খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে উড্ডয়নতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি বই লিখে ফেললেন। তিনি বললেন, গ্লাইডারে বাঁকানো পাখা ব্যবহারই সবচেয়ে ফলপ্রদ।

তিনি নিজেই একটা গ্লাইডার তৈরি করে ফেললেন। গ্লাইডারটা উইলোর সরু-সরু ডাল দিয়ে তৈরি, সুতি কাপড়ে মোড়া। পাখাটার বিস্তার ১০০ বর্গ-ফুট। পঞ্চাশ ফুট-উঁচু এক পাহাড় থেকে গ্লাইডার ওড়ানো হলো। গ্লাইডার উড়লো। এর পরে তিনি আরো দু হাজারটা গ্লাইডার ওড়ান। তাঁর গ্লাইডারের ছবি ১২ পৃষ্ঠায় আছে।

গ্লাইডার ওড়ানোর ব্যাপারে একটা সমস্যা ওঠে: আকাশে গ্লাইডারের গতি নিয়ন্ত্রণ করা। লিলিয়েনথাল তাঁর কোনো কোনো গ্লাইডারে পাখা দুটোকে নিচে ঝুলিয়ে দিতেন আর ভারসাম্য রাখার জন্যে নিজের পা দুটোকে

খুব ঘন-ঘন এদিক-ওদিক দোলাতেন। কাজটা ক্লান্তিকর এবং বিপজ্জনক বটে, কিন্তু আকাশে গ্লাইডারের গতি নিয়ন্ত্রণ করার এ একটা উপায়।

লিলিয়েনথালের এই পরীক্ষাগুলো পরের যুগের বৈজ্ঞানিক আর আবিষ্কারকদের খুবই কাজে লেগেছিলো। তাঁর সবচেয়ে বড়ো দান হলো এই কথাটা প্রমাণ করা যে, চ্যাটালো পাখার চেয়ে বাঁকানো পাখা অনেক বেশি গুণের।

লিলিয়েনথাল তারপর একটি শক্তিচালিত যন্ত্র তৈরি করেন। সেই যন্ত্র পরীক্ষা করতে গিয়ে প্রথম দিনেই তাঁর মৃত্যু হয়।

লিলিয়েনথালের মৃত্যুর পর কাজ থেমে রইলো না। পিলচার, মন্টগোমারি, শ্যানুাট প্রভৃতি অনেকে কাজ করে যেতে লাগলেন। আরো উন্নত ধরনের গ্লাইডার তৈরি হতে লাগলো। শক্তিচালিত যন্ত্র আবিষ্কারের পথ ধীরে ধীরে তৈরি হতে লাগলো।

১৮৪২ সালে হেনসন নামে এক ইংরেজ ষ্টীম ইনজিনে চালিত এক এয়ারোপ্লেনের পেটেন্ট পেলেন। হেনসনের একটু মতিভ্রম হলো : প্লেন ওড়ার আগেই তিনি খুব ফলাও করে বিজ্ঞাপন ছড়াতে লাগলেন, উড়ন্ত প্লেনের ছবি এঁকে লোককে ডেকে দেখাতে লাগলেন। ছবি দেখে লোকে ভাবলো, প্লেন বুঝি সত্যিই উড়েছে। যখন তারা শুনলো, না, এখনো ওড়ে নি—উড়বে, তখন সে কী ভীষণ টিটকিরি! হেনসন ইংল্যাণ্ডে আর টিঁকতে পারলেন না, অস্ট্রেলিয়ায়

গিয়ে বাঁচলেন। অবশ্য সেখানে গিয়ে তিনি তাঁর পরীক্ষা চালিয়ে যেতে লাগলেন। ১৫ পৃষ্ঠার ছবিটা দেখো।

ক্লিমেণ্ট নামে একজন ফরাসী কয়েকটা ষ্টীম-চালিত প্লেন তৈরি করেন। সে-সব প্লেনের চেহারা ছিলো বিদঘুটে— ছোট্ট-ছোট্ট বাদুড়ের মতো. লাফ মেরে-মেরে মাটি থেকে উঠতে চেষ্টা করতো আর কোনো কিছুর সঙ্গে গোঁত্তা লাগলে চুরমার হতো।

হিরাম ম্যাকসিম বিরাট একটা যন্ত্র বানালেন: ১৪৫ ফুট লম্বা, ১০৪ ফুট চওড়া। দুটো প্রোপেলার, প্রত্যেক-টার বেড় ১৭½ ফুট, ৩০০ অশ্বশক্তির দুটো ষ্টীম এন্‌জিনে প্রপেলার-জোড়া ঘুরবে, প্রত্যেকটা এন্‌জিন এক টন ওজন টানতে পারে। যন্ত্রটার ছবি ১৫ পৃষ্ঠায় আছে।

ম্যাকসিম খুব রয়ে-সয়ে সাবধানে এগোচ্ছিলেন। প্লেনটা চলবার জন্যে তিনি মাটিতে একজোড়া রেল পেতে দিলেন। একটু ওপরেও আর-এক জোড়া রেল পেতে দিলেন—প্লেনটা যদি ওড়ে তো উড়ুক. কিন্তু যদি কখনো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তাহলে যেন তাকে টেনে নামানো যায়। ম্যাকসিম প্লেনে কিছু বোঝাও চাপালেন। সব ভালো করে পরীক্ষা করে বয়লারে আগুন ধরানো হলো। ৩০০ পাউণ্ডের বাষ্পচাপ সৃষ্টি করা হলো। মেশিন নিজের জোরে উঠবে কিনা, এবং ওঠার পরও খানিকটা শক্তি বাকি থাকবে কি না, পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া হলো।

ম্যাকসিম আর তাঁর সহকারীরা প্লেনে চাপলেন।

প্রোপেলার-জোড়া বনবনিয়ে ঘুরতে লাগলো, প্লেন দৌড় লাগালো। তারপর প্লেন উঠতে লাগলো, ওপরকার রেল ভেঙেচুরে চৌচির করে প্লেন উড়তে লাগলো—ম্যাকসিমের প্লেন আকাশে উড়তে লাগলো। আকাশে উঠে ম্যাকসিমের দুটি প্রশ্ন: আরো ষ্টীম ছেড়ে দিয়ে আরো ওপরে উঠবো, না তাড়াতাড়ি করে নিচে নামবো। ম্যাকসিম নেমে আসার সিদ্ধান্তই করলেন। নামতে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে প্লেন ধ্বংস হয়ে গেলো।

এই সব অভিজ্ঞতা থেকে এই কথাটা বোঝা যাচ্ছে যে যন্ত্রে আকাশে উড়তে গেলে তিনটি সমস্যার সমাধান করতে হবে: প্রথম, প্লেনে একটি শক্তিশালী কিন্তু ওজনে হালকা শক্তি-জোগানোর যন্ত্র বসাতে হবে; দ্বিতীয়, প্লেনে এমন একটি অঙ্গ রাখতে হবে যা বাতাসের চাপ-আর-টানের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্লেনকে ওপরে তুলবে; তৃতীয়, ওড়ার সময়ে প্লেনের গতি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে।

এ সব সমস্যার সমাধান এক দিনে বা একজনের চেষ্টায় সম্ভব হয় নি। ধীরে ধীরে বহু মানুষের মাথা খাটানো আর হাত লাগানোর ফলেই আকাশে ওড়ার কল্পনা এতোদিনে সত্য হয়ে উঠেছে।

কেলীর কথা মনে আছে? কেলী বুঝেছিলেন যে, চ্যাটালো-পিঠওয়ালা কোনো জিনিস সামনের দিকে চলবার বেগেই ভার বহন করতে পারে। তিনি এ কথাটাও আংশিক ভাবে বুঝেছিলেন যে, চ্যাটালো পাখার চেয়ে পাখির মতো

বাঁকানো পাখা অনেক ভালো। ১৮৬৬ সালে ওয়েনহাম বললেন, পাখা যে ঠেলে তুলে দেয়, পাখার এই ঠেলে তুলে দেওয়ার জোরটা আসে প্রধানত সামনের দিকের কিনারের একটা সংকীর্ণ অংশ থেকে। সুতরাং, যে-পাখার গতিমুখের দিকটা লম্বা আর আড়ের দিকটা ছোটো, সেই পাখাই সবচেয়ে বেশি কাজের হয়। পাখার দৈর্ঘ্যপ্রস্থের এই অনুপাতটাকে বলা হয় 'অ্যাসপেক্ট্ রেশিও'। পাখার পরিকল্পনা করতে বসে এই জিনিসটাকে বিশেষ করে স্মরণে রাখতে হয়।

আকাশে ওড়ার একটা সমস্যা হলো, ওড়ার সময়ে প্লেনের গতি নিয়ন্ত্রণ করা। ল্যাঙলে বলে একজন 'ডাইহেড্রাল কোণ' নামে এক কৌশলে এই সমস্যাটার সমাধান করলেন। কৌশলটা হলো, পাখা দুটোকে এক সরল রেখায় না বসিয়ে কোনাকুনি করে বসানো। তার ফলে, প্লেনটা যদি একদিকে কাত হয়ে যায় তাহলে শুধু সেই দিকটাই উঠে যায়, অন্য দিকটা নয়। প্লেনটা যতোক্ষণ না আবার এক লেভেলে আসে ততক্ষণ অন্য দিকটা নিচে ঝুঁকে থাকে।

১৯০৩ সাল, ১৭ই ডিসেম্বর। দুই ভাই, উইলবার্ আর অরভিল রাইট তাঁদের প্রথম শক্তি-চালিত এয়ারোপ্লেন ওড়ালেন। প্লেনটা ১০৫ ফুট উঠেছিলো, আকাশে সাড়ে তিন সেকেণ্ড ছিলো। আস্তে আস্তে তাঁরা তাঁদের মেশিনে গতিনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাকে অনেক উন্নত করে তুললেন। প্লেনের ছবিটা ১৬ পৃষ্ঠায় আছে।

দুই ভাইয়ের ছিলো এক সাইকেল তৈরির কারখানা। লিলিয়েনথালের দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পরে তাঁরা এই বিষয় নিয়ে বিশেষ চিন্তা করতে লাগলেন, লিলিয়েনথালের অভিজ্ঞতাকে বুঝে দেখতে চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁরা দেখলেন, এ পর্যন্ত মানুষ আকাশে ওঠার কথাই কেবল বেশি করে ভেবেছে, কিন্তু আকাশে অনেকক্ষণ উড়তে পারার কথা তেমন করে চিন্তা করে নি। লিলিয়েনথাল আকাশে উঠেছেন ২০০০ বার, কিন্তু অতো বারে উড়েছেন মাত্র ৫ ঘণ্টা।

উইলবার রাইট লিখেছিলেন, প্রথম সমস্যা হলো উইং তৈরি করা নিয়ে। দ্বিতীয় সমস্যা শক্তি-সরবরাহের ব্যবস্থা নিয়ে। তৃতীয় সমস্যা হলো আকাশে ওড়বার সময় ব্যালেন্স এবং দিক্‌-নিয়ন্ত্রণ করবার।

ক্রমশ এই সমস্যাগুলির সমাধান করা হয়েছে।

কিন্তু আজকের দিনের বিমান-বিশারদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বেশি। আকাশকে জয় করতে হবে। গতি বাড়াতে হবে—আরো আরো অসম্ভব গতি।

তাই আজকের দিনে জেট-প্রপেল্‌ড প্লেনের পরিকল্পনা।

॥ আট ॥



দৈত্যের মতো বড়ো একটা জেট-বম্বার মাটি ছেড়ে আকাশে উঠলো।

একটা পুরনো কথা আবার মনে করিয়ে দিই—এরোপ্লেন বাতাসের চেয়ে ভারি। বাতাসের-চেয়ে-ভারি এরোপ্লেন

ওপরে ওঠে কিসের জোরে? ইনজিনের জোরে। কেমন ক'রে? ইনজিন ঠিক কী করে?

ইনজিন প্রপেলারকে ঘোরায়।

সকলেই দেখেছি, এরোপ্লেনের উইঙ্গ বা ডানার সামনের দিকে আর পেছনের দিকে ইলেকট্রিক ফ্যানের মতো গোটাকয়েক পাখা বা ব্লেড থাকে। কোনো প্লেনে থাকে ছুটো ব্লেড, কোনোটাতে তিনটে, কোন প্লেনে চারটে, কোনো কোনো প্লেনে পাঁচটাও থাকে। এই ব্লেডের সমষ্টিকে বলে প্রপেলার। ইনজিন এই প্রপেলারকে ঘোরায়।

প্রপেলার যখন বাতাসে বনবন করে ঘোরে তখন তার ঝাপটে উইঙ্গ বাতাস কেটে এগোয়। কিন্তু দুই কায়দায় এগোয়। প্রপেলার যখন উইঙ্গ-এর সামনের দিকে থাকে, প্রপেলার তখন উইঙ্গকে বাতাসের মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে যায়। আর, প্রপেলার যখন উইঙ্গ-এর পিছনের দিকে থাকে, প্রপেলার তখন উইঙ্গকে পিছন থেকে ঠেলা দিতে থাকে। এক ক্ষেত্রে, সামনে থেকে টানা; আরেক ক্ষেত্রে পিছন থেকে ধাক্কানো।

প্রপেলারই তাহলে উইঙ্গকে বাতাসের সাহায্য নিয়ে উড়তে সাহায্য করে। বেশির ভাগ এরোপ্লেনই এই প্রপেলারের সাহায্যে ওড়ে।

কিন্তু এই যুগের মানুষের হাতে এমন প্লেন তৈরি হয়েছে যাতে প্রপেলারের দরকার হয় না। সেই প্লেনের নাম

জেট-প্লেন। জেট-প্লেন আজ প্রপেলার-চালিত প্লেনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রপেলার-চালিত প্লেন হটে যাচ্ছে।

জেট-প্লেন দেখতে কেমন?

সেটা একটু পরে বলবো। আগে বুঝে দেখা যাক, কী দোষে প্রপেলার-চালিত প্লেন জেট-প্লেনের কাছে হটে যাচ্ছে।

দোষ দুটি।

প্রথম, প্রপেলার-চালিত প্লেনের ইনজিনকে চালাবার জন্যে যে-পেট্রল পোড়ানো হয় তার তিন ভাগের মাত্র এক ভাগই শক্তিসৃষ্টির কাজে লাগে, বাকি দু ভাগ নানাভাবে নষ্ট হয়ে যায়। পৃথিবীতে অফুরন্ত পেট্রল নেই। কাজেই, এই বিরাট অপচয়টাকে বন্ধ করা দরকার।

দ্বিতীয়, প্রপেলার-চালিত প্লেন খুব উঁচু দিয়ে উড়তে পারে না। অথচ খুব উঁচু দিয়ে উড়তে পারলে তাড়াতাড়ি ওড়া যায়; কেননা, উঁচু আকাশের বাতাস পাতলা বলে বাধা দেয় কম।

জেট-প্লেন এই দুটি দোষ থেকেই মুক্ত।

প্রথমত, জেট-প্লেনে জ্বালানি তেলের শতকরা ৫০ থেকে ৭৫ ভাগ শক্তিসৃষ্টির কাজে লাগে। তা ছাড়া, কেরোসিন তেল, ডিজেল তেল প্রভৃতি নিরেস আর শস্তা তেলেও জেট-প্লেনের কাজ চলে। কাজেই, জ্বালানি তেলের খরচ কম, সদ্ব্যয় বেশি।

দ্বিতীয়ত, জেট-চালিত প্লেন অনেক উঁচু দিয়ে, সুতরাং

অনেক দ্রুত বেগে, উড়তে পারে। মানুষের কতো সময় বাঁচে! আর, সময় বাঁচলো মানেই সময় বাড়লো, মানুষের জীবনের পরিধি বাড়লো, আয়ু বাড়লো, স্বাচ্ছন্দ্য বাড়লো, সুখ বাড়লো।

জেট-প্লেন দেখতে কেমন?

লম্বা টিউবের মতো একটা জিনিসের কল্পনা করে নাও। তার এক প্রান্ত দিয়ে অক্‌সিজেন ঢোকে। আসলে ঢোকে বাতাস, সেই বাতাসের অক্‌সিজেনকে কাজে লাগানো হয়।

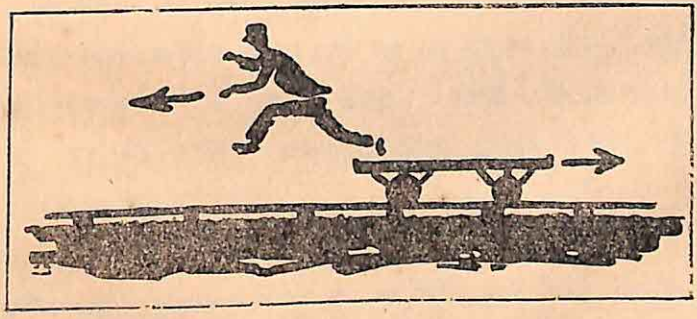
জেট-প্লেনে একটি জায়গা আছে, তাকে বলে কম্‌বাস্‌শান চেম্বার। বাঙলায় বলবো জ্বালানি কামরা। বাতাসকে চাপ দিয়ে এই জ্বালানি কামরার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ঐ জ্বালানি কামরার কাছাকাছি আছে তেলভরতি ট্যাঙ্ক। ট্যাঙ্ক থেকে তেল এসে কামরার মধ্যে পড়ে। এরপর ইলেকট্রিক স্পার্ক দিয়ে জ্বালানি কামরার মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। তাতে প্রচুর গ্যাস আর প্রচণ্ড তাপ সৃষ্টি হয়। প্রচণ্ড তাপে স্ফীত হয়ে সেই গ্যাস বেরিয়ে আসতে চায়। প্লেনের অপর প্রান্তে বেরোবার পথও করে দেওয়া আছে, সেই পথ দিয়ে গ্যাস দারুণ বেগে বেরিয়ে আসে। নির্গত গ্যাসের সেই প্রচণ্ড গতিতে জেট-প্লেনও গতি পায়, হু-হু করে উড়ে চলে।

কিন্তু কেন? তা বুঝতে হলে বিজ্ঞানের একটি নিয়ম শিখতে হবে। নিয়মটি হলো: প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান ও

বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। একটা উদাহরণ দিলে নিয়মটা বুঝতে সাহায্য হবে।

ডাঙার দু-চার হাত তফাত দিয়ে নৌকো চলেছে। ডাঙায় পড়বার জন্যে আমি চলন্ত নৌকো থেকে লাফ দিলাম। লাফ দিতে, আমার পা-জোড়া ডাঙায় না পড়ে পড়লো জলে। কেন?

লাফ দিতে গিয়ে আমাকে একটা বল প্রয়োগ করতে হলো। যে-বল দিয়ে আমি আমার শরীরটাকে সামনের দিকে ঠেলে দিলাম, সেই বলের সমান আর বিপরীত একটা বল নৌকোটাকে পিছনে ঠেলে দিলো—ডাঙা থেকে নৌকো আরো খানিকটা তফাতে সরে গেলো আমি ডাঙায় না পড়ে জলে পড়লাম।



ছেলেটা যে-দিকে লাফালো গাড়িটা ঠিক তার উলটো দিকে হটলো ; হাওয়া থাকুক আর নাই থাকুক এ-রকমটা হবে। এই নিয়মটির উপরই নির্ভর করে জেট আর রকেটের আকাশে-ওঠা।

ঠিক এইভাবেই জেট-প্লেনের এক মুখ দিয়ে যখন দারুণ বেগে গ্যাস বেরিয়ে যায়, তখন তার ফলে তারই সমান আর বিপরীত একটা বেগ সৃষ্টি হয়। সেই বেগই জেট-প্লেনকে ওড়ায়।

জেঠ-প্লেনের আরো গুণ আছে। প্রপেলার-চালিত প্লেন ওড়বার সময় কাঁপে। সেই কাঁপুনিতে পাইলট ক্লান্ত হয়ে পড়েন, যাত্রীরাও অস্বস্তি বোধ করেন। জেট-প্লেনে কোনো কাঁপুনি হয় না, শব্দও যথেষ্ট কম হয়। তার ফলে, যাত্রীরা অনেকটা আরামে ভ্রমণ করেন।

জেট-প্লেনে তেলের সাশ্রয়, সময়ের সাশ্রয়, দেহের আরাম। জেট-প্লেনের ভবিষ্যৎ তাই উজ্জ্বল।

॥ নয় ॥

মানুষ আকাশে ওড়ার যতো যন্ত্র বানিয়েছে তাদের মোটামুটি ছু ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—বাতাসের চেয়ে হালকা যন্ত্র আর বাতাসের চেয়ে ভারি যন্ত্র। বেলুন বাতাসের চেয়ে হালকা, এরোপ্লেন বাতাসের চেয়ে ভারি।

বাতাসের-চেয়ে-ভারি যন্ত্রগুলোকেও ছু ভাগে ভাগ করা চলে। এক শ্রেণীতে পড়বে সেই সব যন্ত্র যাদের প্লেনের সঙ্গে ডানা শক্ত করে এঁটে বসানো থাকে। অপর শ্রেণীতে পড়ায় সেই সব যন্ত্র যাদের ডানা নড়েচড়ে, ঘোরে আর সেই ঘোরার ফলেই যন্ত্র ওড়ে।

প্রথম শ্রেণীর যন্ত্রের কথা বলা হয়েছে। এখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর যন্ত্র হেলিকপ্টার আর অটোজিরোর কথা কিছুটা আলোচনা করা যাক।

হেলিকপটারে আর অটোজিরোতে ছটো, তিনটে বা চারটে পাখা লাগানো থাকে। তাদের একত্রে বলা হয় রোটর।

হেলিকপটারের রোটর ইনজিনের সাহায্যে ঘোরে। অটোজিরোর রোটরকে ওড়বার আগে একবার ঘুরিয়ে দিতে হয়, তারপর থেকে সে নিজে-নিজেই ঘুরতে থাকে

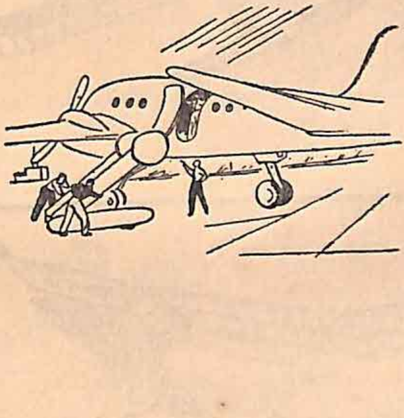
হেলিকপটারকে আকাশে তোলে রোটর। এই রোটরই আবার তাকে সামনে-পিছনে ডাইনে-বাঁয়ে ঘোরায়। রোটরের সাহায্যে হেলিকপটার সোজা ওপরে উঠে যায়, এই রোটরই আবার তাকে সামনে আগিয়ে দেয়, পিছু হটায়, ডাইনে-বাঁয়ে ঘোরায়। যন্ত্রকে যেদিকে নিয়ে যেতে চাইছি রোটরকে সেই দিকে হেলিয়ে দিলে অথবা রোটরের কোণকে সেই মুখে ঘুরিয়ে দিলেই এ কাজ হতে পারে।

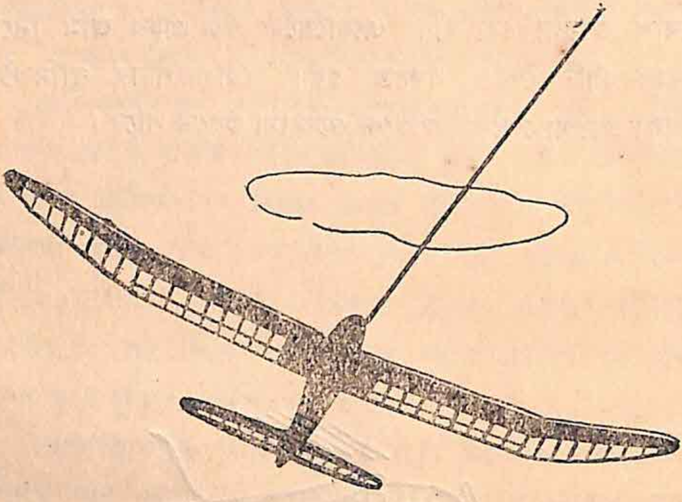
অটোজিরোতে কিন্তু তা হয় না। অটোজিরোর রোটর যন্ত্রকে শুধু ওপরে তুলে দেয়। চারপাশে ঘোরাবার জন্য অটোজিরোতে প্রপেলার বসাতে হয়।

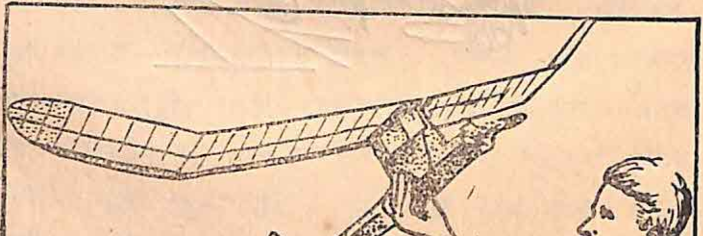
একটা-রোটরওয়ালা হেলিকপটার আছে, একাধিক-রোটরওয়ালা হেলিকপটারও আছে। যে-সব হেলিকপটারে ছুটো করে রোটর, সেখানে রোটরজোড়াকে নানাভাবে বসানো হয়। কোনো যন্ত্রে একটার ওপরে একটা বসানো থাকে, কোনো যন্ত্রে পাশাপাশি। ছুটো ছুই ভিন্ন মুখে ঘোরে। কোনো কোনো যন্ত্রে একটা থাকে সামনে, আরেকটা পিছনে।

এরোপ্লেন আর হেলিকপটার। স্থির ডানা আর ঘুরন্ত ডানা। তফাতটা মোটামুটি বোঝা গেলো। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে, হেলিকপটারের ব্যবহারিক উপযোগিতা কী? হেলিকপটার ওড়ালে বিশেষ কী সুবিধা হয়?

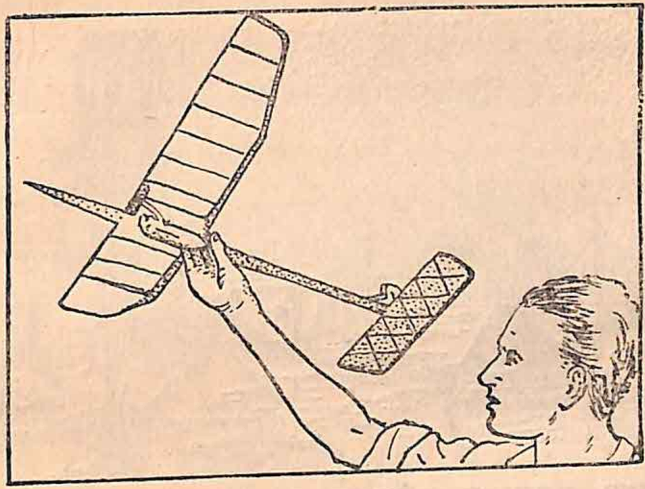
হেলিকপটারের সুবিধা হলো এই : উঠতে-নামতে সে বেশি জায়গা নেয় না। এরোপ্লেনের জন্য প্রচুর জমি নিয়ে বিমানঘাঁটি তৈরি করতে হয়। হেলিকপটার খানিকটা ফাঁকা জায়গা পেলেই স্বচ্ছন্দে ওঠানামা করতে পারে।

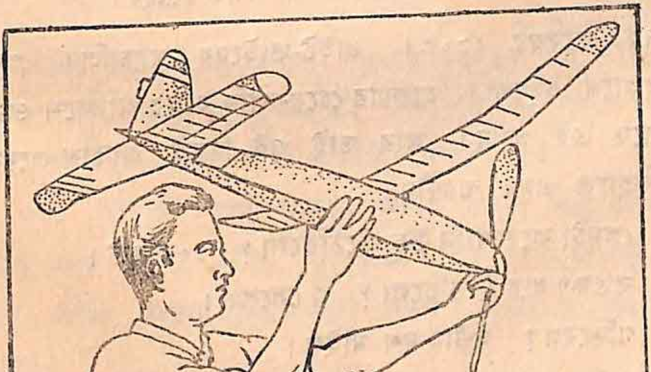




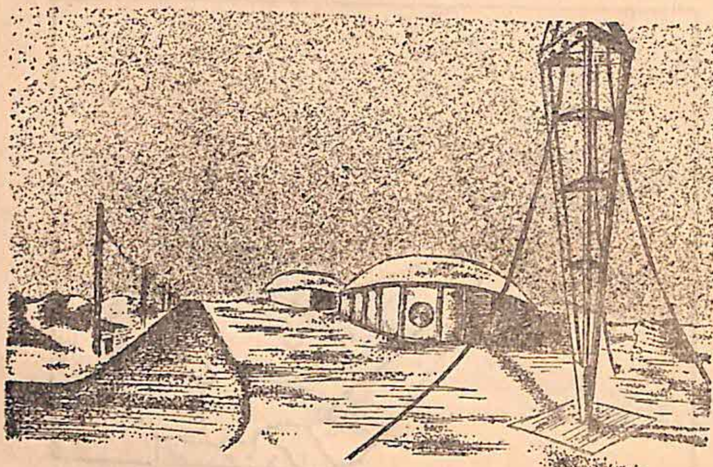


খেলার এয়ারোপ্লেন। বানাবার চেষ্টা করবে নাকি? কয়েকটি মডেলের ছবি দেওয়া হলো।





।। দশ ।।



মঙ্গলগ্রহে পৌঁছুবার পর যে-তাঁবু ফেলা হবে তার চেহারা এই রকম হবে নাকি ? এক শিল্পী তো তাই কল্পনা করছেন।

১৭ই ডিসেম্বর, ১৯০৩। রাইট-ভাইদের যন্ত্রচালিত প্লেন আকাশে উড়লো। হাওয়ার-চেয়ে-ভারি যন্ত্রের আকাশে ওড়া বলতে এই প্রথম। আর তাই ওই দিনটি আকাশ-জয়ের ইতিহাসে এমন স্মরণীয়।

প্লেনটা কতোখানি উঁচু উঠেছিলো ? ১০৫ ফুট।

কতক্ষণ ধরে উড়েছিলো ? ৩ সেকেণ্ড।

গতিবেগ ? ঘণ্টায় দশ মাইল।

হাসি পাচ্ছে ? আজকের বিমান-বিশারদ যদি এই হিসেব শুনে হেসে ওঠেন তাহলে অন্যায় বলবো না। কেন

না, একখানা আধুনিক জেট-প্লেনের পাশে এ-হিসেব সত্যি বলতে ছেলে খেলাও নয়। অথচ কতোদিনই বা আর আগে-কার কথা? এই তো যেন সবে সেদিন! আর সেদিন এর চেয়ে পরমাশ্চর্য ঘটনা মানুষের আর যেন জানা নেই!

তাহলে, মাত্র এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই কী কাণ্ড না ঘটে গেলো! আর যে-গতিতে মানুষ এগিয়ে চলেছে তার কথা মনে রাখলে আমরা কি সত্যিই কল্পনা করতে পারবো—

আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে আরো কতো কী ঘটবে? আগামী একশো বছরের মধ্যে? হাজার বছরের মধ্যে? অথচ, মানুষের ইতিহাসে এই পঞ্চাশ বা এমনকি হাজার বছরের কথাই বা আর কতোটুকু সময়? কিছুই নয়। যেন চোখের পলক।

এসো কল্পনা করা যাক। হাজার বছরের কথা থাক। হাজার বছর পরে আকাশ-জয়ের ইতিহাসে কী ঘটবে-না-ঘটবে তা কল্পনা করবার শক্তি সত্যিই আমাদের নেই।

বরং আগামী পঞ্চাশ-বছরের কথাই কল্পনা করা যাক —যা প্রায় ঘনিয়ে এলো, যা প্রায় বাস্তব হতে চলেছে। তাই, সত্যি বলতে, যাকে আর নিছক কল্পনা না বলাই ভালো।

কিসের কথা বলছি? চাঁদে যাবার কথা। মঙ্গলগ্রহে যাবার কথা। গ্রহান্তর-ভ্রমণের কথা।

কিসে চেপে যাবো? জেট-প্লেন? না। তাও নয়। তাহলে?

রকেট।

রকেট কী? রকেট কী করে ওড়ে?

আসলে, নিয়মটা জেট-প্লেনের মতোই। ব্যবস্থাও অনেকটা সেই রকমই। জেট-প্লেনের কথা মনে আছে তো? রকেটের বেলাতেও একটা জায়গায় দাহ্যবস্তু (তেল) পোড়ে আর ওই পোড়ার দরুন যে-গ্যাস হয় তা প্রবল তোড়ে রকেটের পিছন দিয়ে বেরিয়ে যায়—তারই ঠেলায় জেট আর রকেট ছুটে চলে সামনের দিকে—হুহু করে।

পিছন থেকে গ্যাসের তোড় বেরিয়ে গেলে জেট আর রকেট সামনের দিকে কেন ছুটে চলবে? একটা ছোট্ট পরীক্ষা করেই দেখো না; তেমন কিছু তোড়জোড় করতে হবে না।

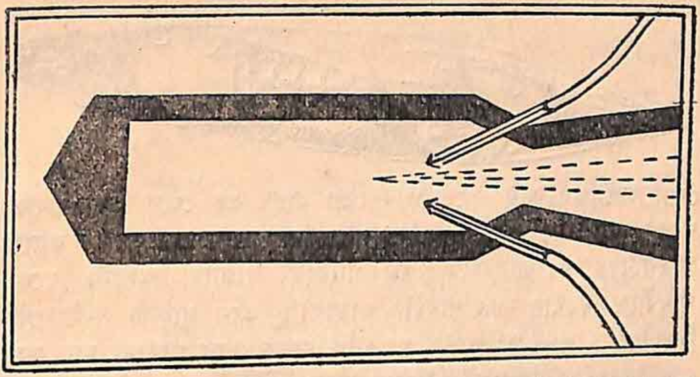
বেলুনে ফুঁ দিয়ে বেলুনটা ফোলাও। তারপর আঙুল দিয়ে বেলুনের মুখটা চেপে ধরো। তারপর, হঠাৎ আঙুল দুটো ছেড়ে দাও—

কী হবে?

সাধারণ রবারের বেলুনের মুখ দিয়ে দারুণ জোরে হাওয়া বেরিয়ে যাবে। কিন্তু শুধুই কি তাই? বেলুনটা সঙ্গে সঙ্গে উলটো-মুখ-বরাবর হুহু করে দৌড়ে যাবে।

এই নিয়ম। আর এই নিয়মের উপর নির্ভর করেই জেট-প্লেন তৈরি। রকেটও তাই।

তাহলে তফাতটা কোথায়?

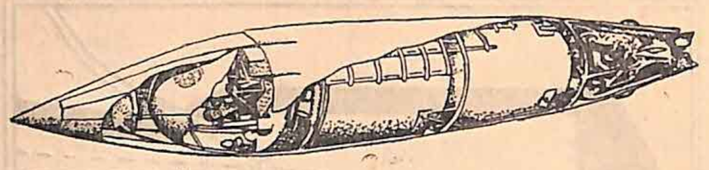


রকেট এঞ্জিনের নকসা। মাঝখানে আগুন জ্বলবার জায়গা; নলে করে একদিক থেকে দাহ্য-বস্তু আর একদিক থেকে অক্সিজেন পাঠানো হচ্ছে। মাঝখানে স্পার্ক দিয়ে আগুন ধরানো হচ্ছে; নিচের মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে গ্যাসের হল্‌কা— তারই ঠেলায় রকেটটা উল্টো দিকে (উপর দিকে) উঠে যাবে।

প্রধান তফাত হলো, জেট-প্লেনের বেলায় অক্সিজেন সংগ্রহ করা হয় বাইরের বাতাস থেকে আর রকেটের বেলায় প্লেনের মধ্যেই অক্সিজেন বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হবে।

গ্রহান্তরে যাবার সময় জেট-প্লেনে কেন হবে না? কেন রকেট লাগবে? দুয়ের মধ্যে তফাত থেকেই সে-কথা বুঝতে পারা যাবে।

পৃথিবী ছেড়ে যেতে হবে। তার মনে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ছেড়েও। বাতাস আর কতোখানি পর্যন্ত? মাত্র শ'দুয়েক-মাইল উপরে উঠলেই তো বায়ুমণ্ডল শেষ। জেটে চেপে যদি যেতে চাও তাহলে তখন বাতাস কোথা থেকে

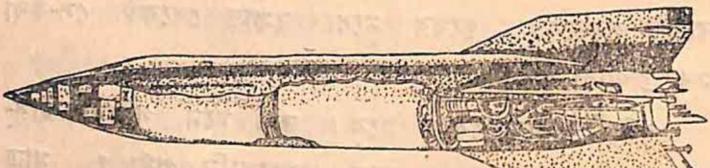


কোন ধরনের রকেটে চেপে ভবিষ্যতের মানুষ গ্রহ থেকে গ্রহান্তর যাত্রা করবে, তারই একটি অতি আধুনিক পরিকল্পনা। ছুঁচোলো ডগাটির কাছেই পাইলটদের ঘর; তার সঙ্গে একটা প্যারাসুট লাগানো আছে। রকেট পৃথিবীতে ফেরবার সময় পৃথিবীর কাছাকাছি এসে পাইলট একটা সুইচ টিপে দেবে; তখন পাইলটের ঘর বাকি রকেট থেকে আলাদা হয়ে যাবে এবং প্যারাসুটে ভাসতে ভাসতে সেটি মাটিতে পৌছুবে।

পাবে? বাতাস না থাকলে অক্সিজেন কী করে পাবে? অক্সিজেন না হলে যে আগুনই জ্বলে না!

অতএব, জেট চলবে না। রকেট চাই।

রকেটের ওড়ার পক্ষে বায়ুমণ্ডলটা বরং একটা বাধার মতো। কেননা, রকেটের পিছন থেকে যে-গ্যাস বেরুবে তা বাতাসে খানিকটা বাধা পায়। তাই বায়ুমণ্ডলটুকু পার হয়ে যাবার পরই রকেট অনেক ভালো করে চলতে পারবে।



দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত ভি-২ রকেট। মানুষের এমন আশ্চর্য আবিষ্কার কবে যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছেড়ে শুধুমাত্র শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হবে?

বায়ুমণ্ডলের পর কী? ফাঁকা আকাশ, মহাশূন্য। এয়ারোপ্লেন হলে সেখানে উড়তেই পারতো না। বাতাসের বাধা না থাকলে এয়ারোপ্লেন উড়বে কী করে?

তাহলে, রকেট চেপে যেতে হবে।

যাবার সমস্যাগুলো এবার আর একটু ভালো করে ভাবা যাক।

পৃথিবী থেকে চাঁদ প্রায় ২৪০০০০ মাইল। মঙ্গলগ্রহ ২৪০০০০০০ মাইল। বুধ ৩৫০০০০০০ মাইল। পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে যে নক্ষত্রটি আছে তার নাম প্রক্সিমা, পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব প্রায় ৪ আলোক-বর্ষ। আলোক-বর্ষ মানে এক-বছরে আলো যতোখানি পথ পার হয়ে যায়। কতোখানি? আলোর গতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল। তাহলে এক আলোক-বর্ষ মানে ১৮৬০০০ × ৬০ × ৬০ × ২৪ × ৩৬৫ মাইল। পৃথিবী থেকে প্রক্সিমা কতোদূর তা আঁক কষে বের করে নাও।

নক্ষত্রে যাওয়া-আসা পরে হবে। সে-সব ভয়ানক বেশি দূরের ব্যাপার। আপাতত চাঁদ এবং গ্রহতে যাবার কথাই ভাবা যাক।

চাঁদ ২৪০,০০০ মাইল দূরে। ভালো এয়ারোপ্লেন ঘণ্টায় ৩৫০ মাইল চলে। তাতে চেপে চাঁদে যাওয়া যদি সম্ভব হতো তাহলেও মাসখানেক সময় লাগতো। কিন্তু তা হয় না। সাধারণ এয়ারোপ্লেনের সাধারণ এঞ্জিন ব্যবহার করে আর সারাক্ষণ এঞ্জিন চালিয়ে চাঁদে পৌঁছুতে হলে কী পরিমাণ

পেট্রল বা দাহ্যবস্তু লাগবার কথা তাই ভাবতে আকুল হয়ে যেতে হবে।

কিন্তু পুরো পথ এঞ্জিন চালাবার দরকার হবে না। কেন তাই বলি।

মোটরগাড়ির পেট্রল বাঁচাবার জন্যে ড্রাইভারেরা অনেক সময় কী করে দেখেছো? প্রথমে গাড়িটার স্পিড দারুণ বাড়িয়ে দেয়, তারপর গাড়িটা যখন ভীষণ জোরে ছুটতে শুরু



ষাট মাইল উঁচু থেকে পৃথিবীকে দেখতে এই রকম লাগবে।

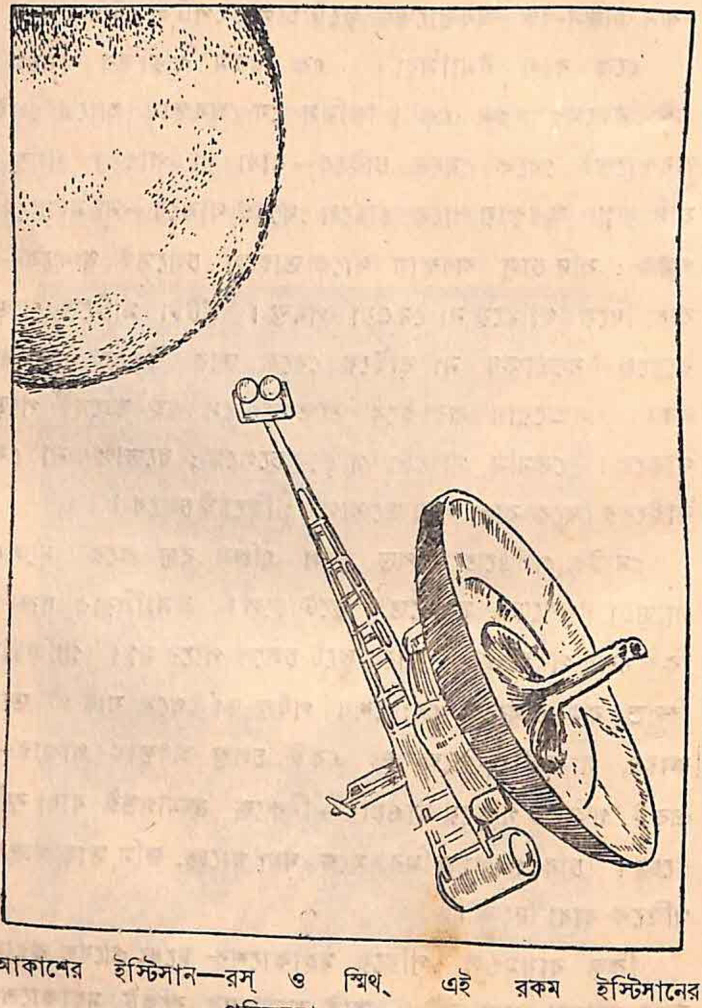
করেছে তখন টুক করে এঞ্জিন বন্ধ করে দেয়। ইঞ্জিন বন্ধ হলেই কিন্তু গাড়ি থেমে যায় না। বেশ অনেকখানি পথ ওই রকম এঞ্জিন-বন্ধ অবস্থাতেই ছুটে চলে, পেট্রল বেঁচে যায়।

একে বলে ইনার্সিয়া। এক রকম প্রকৃতির নিয়ম। এই নিয়মের দরুন একটা জিনিস যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থাতেই থেকে যেতে চাইবে—বাধা না পাওয়া পর্যন্ত। যদি থামা অবস্থায় থাকে তাহলে থেমেই থাকবে—না নাড়ানো পর্যন্ত ; যদি চালু অবস্থায় থাকে তাহলে চলতেই থাকবে—বাধা দিয়ে থামিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত। ইঁটটা মাটিতে পড়ে রয়েছে—যতোক্ষণ না বাইরে থেকে তার উপরে কোনো রকম বলপ্রয়োগ করা হবে ততোক্ষণ সে ওই ভাবেই পড়ে থাকবে। তেমনি গাড়িটা গড়িয়ে চলেছে ; যতোক্ষণ না সে বাইরের থেকে বাধা পায় ততোক্ষণ গড়িয়েই চলবে।

মোটর গাড়িতে স্পিড তুলে এঞ্জিন বন্ধ করে দিলেও গাড়িটা স্পিডের মাথাতেই ছুটে চলে। ইনার্সিয়ার দরুন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একই ভাবে ছুটে চলতে পারে না। গাড়িটার স্পিড কমতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তা থেমে যায়। তার কারণ, গাড়িটার পক্ষে ওই একই চলন্ত অবস্থায় থাকার—একই গতিতে গড়িয়ে যাওয়ার—বিরুদ্ধে ক্রমাগতই বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। চাকাগুলো জমির সঙ্গে ঘষা খাচ্ছে, জমি তার স্বচ্ছন্দ গতিকে বাধা দিচ্ছে।

কিন্তু বায়ুমণ্ডল পেরিয়ে মহাকাশের মধ্যে প্রবেশ করলে আর কোনো বাধা নেই। তাই আমাদের রকেট মহাকাশের

মধ্যে যদি একটা প্রচণ্ড স্পিড তুলে প্রবেশ করে তাহলে তখন ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়েও সেই গতিতেই ছুটে চলা যাবে—



আকাশের ইস্টিসান—রস্ ও স্মিথ্ এই রকম ইস্টিসানের পরিকল্পনা করেছেন।

পেট্রল পোড়াতে হবে না। রকেট চলবে ইনার্সিয়ার নিয়ম অনুসারে।

এই ভাবে বেশির ভাগ পথ ইনার্সিয়া-য় চললেও কিন্তু পেট্রল খুব কম লাগবে না। হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে বেশির ভাগ পথ এঞ্জিন বন্ধ করে চললেও চাঁদে যেতে হলে বহুত পেট্রল লাগবে—আমাদের রকেটটার যা ওজন হবে তার প্রায় বিশ গুণ ওজন হবে প্রয়োজনীয় পেট্রলের। এ-সমস্যার সমাধান যে কী করে হতে পারে তা এখনো বোঝা যাচ্ছে না।

সমস্যাটার সমাধান হিসেবে কেউ কেউ বলছেন, পৃথিবী ছাড়িয়ে কয়েকশো মাইল দূরে একটা স্পেস-স্টেশন—মহাকাশের ইস্টিশান—বানিয়ে নিলে হয়। সে-ইস্টিসান কী রকম হবে? একটি কৃত্রিম উপগ্রহর মতো—উপগ্রহ যেমন পৃথিবীকে ছেড়ে যায় না, পৃথিবীকে ঘিরেই ঘোরে—মহাকাশের এই ইস্টিসানও তেমনি হবে। তার আবার একটা নিজস্ব আবর্ত-বেগ (সেন্ট্রিফুগাল মোশান) থাকবে ; তারই দরুন সেটা পৃথিবীর উপরে পড়ে যাবে না। আমাদের রকেটটা পৃথিবী ছেড়ে বেরিয়ে প্রথমে সেখানে দাঁড়াবে ; সেখান থেকেই পেট্রল, রসদ প্রভৃতি ভরে নেবে, তারপর যাত্রা শুরু করবে চাঁদ বা মঙ্গলগ্রহ বা বুধগ্রহর দিকে।

অবশ্য এ-রকম একটা স্টেসন যে না-করলেই নয়, তা বলা যায় না। এমন হতে পারে যে দেড়শো-দুশো মাইল উপরে ওঠবার পর আমাদের রকেটটাই পৃথিবীর একটা উপগ্রহর মতো হয়ে যাবে আর তখন পৃথিবী থেকে অন্যান্য রকেটে করে



চাঁদে পৌছুবার পর এই রকম পাহাড় দেখবো নাকি? আর, চাঁদ থেকে দেখবো আকাশে পৃথিবী উঠেছে।

তার কাছে রসদ পেট্রল প্রভৃতি পৌঁছে দেওয়া হবে। তারপর সেটা যাত্রা শুরু করবে মহাকাশের মধ্যে।

এবার গতিবেগের সমস্যাটা ভেবে দেখা যাক। কী গতিতে ছুটতে হবে? চাঁদ, মঙ্গলগ্রহ বা বুধগ্রহে যেতে হলে সেকেণ্ডে ছ-সাত মাইল গতি হওয়া দরকার; অন্যান্য গ্রহর বেলায় আট-দশ মাইল। তার মানে, যাত্রা শুরু করে স্পিড বাড়াতে বাড়াতে ওই রকম সাংঘাতিক একটা গতিতে পৌঁছোনো দরকার, তারপর এঞ্জিন বন্ধ করে দেওয়া যাবে। কিন্তু মানুষের শরীর তো! এমন প্রচণ্ড গতি কি সহ্য করতে পারবে?

যে-কোনো গতিই মানুষের শরীরের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব; কিন্তু যে-কোনো হারে গতিবেগ বাড়িয়ে গেলে তা সহ্য করা সম্ভব নয়। অভিজ্ঞতায় বোঝা গিয়েছে, মিনিটে দেড় মাইল—বা বড়ো জোর দু মাইল—হারে গতিবেগ বাড়িয়ে যাওয়া যায়, তার বেশি নিরাপদ নয়। তাহলে, শরীরে সইয়ে ওই রকম সেকেণ্ডে ছ-সাত মাইল গতিবেগ তুলতে কতোক্ষণ সময় যাবে?

প্রথমবার গিয়েই আমরা চাঁদ বা মঙ্গলগ্রহে নামবার চেষ্টা করবো নাকি? না করাই ভালো। সে-সব পরে হবে। প্রথম যাত্রায় বরং চাঁদ বা গ্রহকে শুধু একবার প্রদক্ষিণ করে আসাই ভালো। আমাদের রকেটে চেপে পৃথিবীটিকে প্রদক্ষিণ করতে ঘণ্টা দেড়েক সময় লাগবার কথা। চাঁদকে একটা চক্কোর মেরে আসবার জন্যে যাতায়াতের সময় নিয়ে মোট দিন দশেক সময় লাগবে বলে মনে হয়। মঙ্গলগ্রহ

ঘুরে আসতে মাসখানেক যাবে। এই সময়ের মধ্যে প্রায় শতকরা ৯৯ ভাগ এঞ্জিন বন্ধ থাকবে, ইনার্সিয়ায় রকেট চলবে।

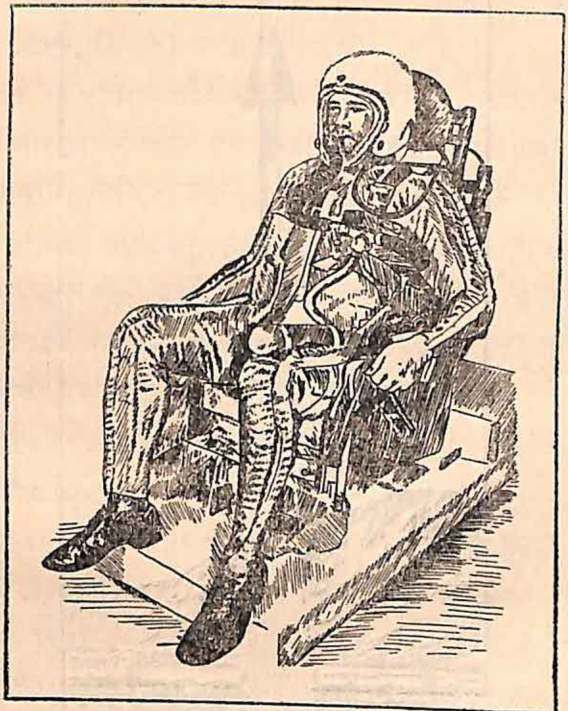
পথে কোনো বিপদ-আপদের ভয় আছে? আছে বই কি। মঙ্গলগ্রহে যাবার পথে গ্রহাণুপুঞ্জর (আস্‌ট্রয়েড্‌) ঝাঁক পড়বে। সাবধানে পাশ কাটিয়ে যেতে না পারলে ধাক্কা খেয়ে রকেট চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। তাছাড়া, উল্কা। সৌর-জগতের যে-কোনো জায়গায় তার আবির্ভাব ঘটতে পারে। ধাক্কা লাগলে সর্বনাশ! রকেটে একটা রাডার লাগিয়ে নিও, এ-ধরনের আগন্তুকদের সংবাদ পেয়ে যাবে। আগে থাকতে হুঁশিয়ার হওয়া দরকার।

পৃথিবীর সঙ্গে সংবাদ-বিনিময় চালাতে হবে বইকি। আধুনিক রেডিও-এন্‌জিনিয়ারিং-এর কৃপায় তা আর অসম্ভব হবে না।

রকেটের ভেতরকার কামরাগুলো? খুব যত্ন করে, হুঁশিয়ার হয়ে তৈরি করতে হবে। ভেতরকার আবহাওয়াটা যেন আমাদের আয়ত্তে থাকে। মনে রেখো, যতোক্ষণ সূর্যের তেজ পড়বে ততোক্ষণ রকেটটা দারুণ তেতে উঠবে। আবার, তার অভাবে হিমশীতল অবস্থা। কামরার মধ্যে তাত কমানো-বাড়ানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে—ভেতরের আবহাওয়াকে আয়ত্তে রাখবার জন্যে আরো নানা ব্যবস্থা করা চাই। বিজ্ঞানের খুব উন্নতি হয়েছে। এ-সব ব্যবস্থা করে রাখা অসম্ভব হবে না।

মহাকাশের মধ্যে দিয়ে যাবার সময়ে সূর্য আর নক্ষত্রদের দারুণ উজ্জ্বল দেখাবে। বাকি সব নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। এ-

অবস্থায় কী ব্যবস্থা করা দরকার তাও যাত্রা করবার আগেই ভেবে নিতে হবে বইকি।

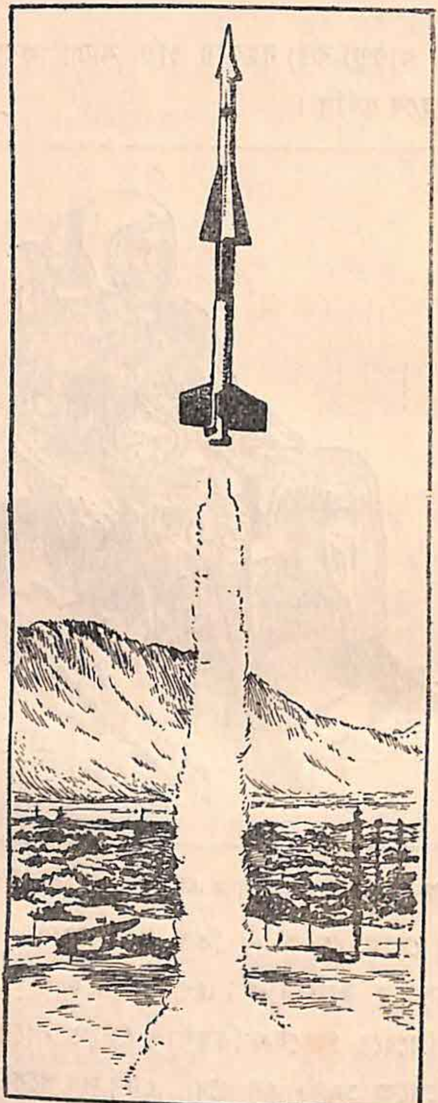


রকেটে চেপে গ্রহান্তরে যাবার সময় এই রকম বেশভূষা করতে হবে।

সব তো বোঝা গেলো। কিন্তু কথা হচ্ছে, রকেট তৈরি করবার ব্যাপারে কতোটা-কী এগুনো গিয়েছে?

কিছুটা গিয়েছে। বেশ কিছুটাই বলতে পারো।

১৯৩০ থেকে ১৯৪০-এর মধ্যে এমন সব রকেট তৈরী করা গিয়েছে যা প্রায় ৮ মাইল পর্যন্ত উপরে উঠেছিলো। ১৯৪৯-এ



বিমানধ্বংসী-রকেট।

আর-এক রকম নতুন কায়দায় রকেট তৈরী হয়েছিলো যা কিনা প্রায় ২৫০ মাইল পর্যন্ত আকাশে উঠে যেতে পারে। তার বেলায় যেন দুধাপে ওঠা। দুটো এঞ্জিন। একটায় একধাপ উঠলে, দ্বিতীয়টায় দ্বিতীয় ধাপ।

স্পিড বা গতিবেগের কথাটাই খুব জরুরি। প্রচণ্ড গতিতে যেতে না পারলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান কাটিয়ে গ্রহান্তরের দিকে এগুনো যাবে না। স্পিড-ও অনেকটাই বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। আজকালকার দিনে সেকেণ্ডে প্রায় দেড় মাইল পর্যন্ত স্পিড তোলা যাচ্ছে। স্পিড কি করে বাড়বে তা মনে আছে তো? রকেটের পিছন দিয়ে পেট্রল-পোড়া গ্যাস যতো জোরে বেরুবে রকেটটাও ততো জোরেই সামনের দিকে ছুটবে। তাই এই ব্যবস্থাটার উন্নতির উপরই অনেক কিছু নির্ভর করেছে।

আজকের দিনে যে-সব রকেট তৈরি হয়েছে তাতে করে পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত যাতায়াত অনেক সহজসাধ্য হচ্ছে। এ-সবই খুব উন্নতির লক্ষণ। কিন্তু মহাকাশে পাড়ি দেবার পক্ষে এ-সব রকেট চলবে না। প্রথমত, এগুলো তার পক্ষে বড্ড ভারি। দ্বিতীয়ত, তেমন জোরালোও নয়। এঞ্জিনও তেমন বেশি তাপ সইতে পারে না। এই সব অনেক অসুবিধে।

তাছাড়া ফুয়েল বা দাহ্যবস্তুর সমস্যাটাও এখনো চোকানো যায় নি। রকেট হাঁকাবার জন্যে পেট্রলই বলো আর যাই বলো,—একটা কিছু তো পোড়াতে হবে। তাকেই বলা

হচ্ছে দাহ্যবস্তু বা ফুয়েল। এমন ফুয়েলের ব্যবস্থা করতে হবে পেট্রলের তুলনায় যার অসুবিধে অনেক কম।

অ্যাটমিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে রকেট চালাতে শিখলে এই দাহ্যবস্তুর সমস্যাটা অনেক কমবে।

কিন্তু এখনো কমেনি।

এখন একটা রকেটে করে যে-পরিমাণ দাহ্যবস্তু নিয়ে যাওয়া সম্ভব তার ওজন রকেটের তুলনায় প্রায় তিনগুণ। হয়তো একে আরো ডবল করে নেওয়া যায়। কিন্তু তাতেও হবে না। এ-রকম দাহ্যবস্তু ব্যবহার করে রকেট চালিয়ে চাঁদে যেতে হলে রকেটের তুলনায় অন্তত বিশগুণ বেশি ভারি দাহ্যবস্তু সঙ্গে নিতে হবে। যে-রকম রকেট বানানো গিয়েছে তাতে একাজ হবে না।

কিন্তু আজ না হলেও আগামী কাল হবে।

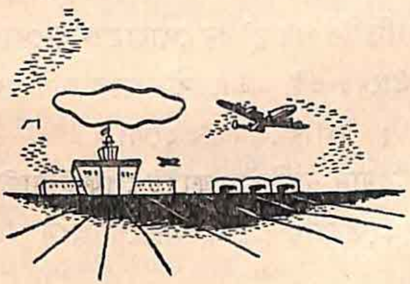
গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই আকাশ-জয়ের অভিযানে যা-উন্নতি হয়েছে তার কথাটা ভুললে চলবে না। সেদিন মাত্র ৩ সেকেণ্ড ধরে আকাশে উড়তে পেরেই মানুষ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলো! শুনলে আজ মনে হয়, ছেলেখেলা।

পঞ্চাশ বছর পরে যা পারা যাবে তার তুলনায় আজকে যা পারা যাচ্ছে তাও এইরকম ছেলেখেলার মতোই শোনাবে হয়তো।

সপ্তম পৃষ্ঠায় লেঅনার্দো-দাভিঞ্চির আঁকা ছবিটা দেখো: আকাশচারী কোনোরকম যন্ত্র যে বানানো সত্যি সম্ভব

এ-কথা তখনো শুধুমাত্র কল্পনাই—তাও যার-তার মাথায় এ কল্পনা আসেনি, লেয়নার্দোর মতো বড়ো বৈজ্ঞানিক, লেয়নার্দোর মতো বড়ো শিল্পীর মাথাতেই এ-কল্পনা উঁকি দিতে পেরেছে।

আর তার তুলনায় আজ ?
মানুষ কতো এগিয়েছে !
মানুষ আরো কতো এগুবে ?



॥ এগারো ॥

মহাকাশে অভিযানের কল্পনা ছেড়ে ঘরের কথায় ফিরে আসা যাক। আমাদের দেশের কথা। ভারতবর্ষের কথা। আমাদের দেশের বিমান-বিশারদদের কথা।

এই সেদিনকার একটা ঘটনা মনে পড়লো।

তেন্‌জিং আর হিলারি এভারেস্ট-এর চুড়োয় উঠেছিলেন; তাঁদের এই কীর্তিটির পর দু'দিন পোহাতে-না-পোহাতেই সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁদের ওই এভারেস্ট-জয়ের ছবি খবরের কাগজে বেরিয়ে গেলো! কী করে সম্ভব হলো?

ভারতীয় বিমান বাহিনীর ফ্লাইট-লেফ্‌টেন্যান্ট জওয়াল-এর উপর আগে থাকতে ভার ছিলো এয়ারোপ্লেনে করে গিয়ে ছবি তুলে আনবার।

এ-কাজ নিশ্চয়ই পায়ে হেঁটে হিমালয়ের ওই চুড়োটিতে পৌঁছোনোর মতো কঠিন নয়। তুলনাই হয় না। তবুও রীতিমতো কঠিন কাজ বইকি। ফ্লাইট লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট জওয়াল ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটি ফাইটার প্লেনে চেপে গিয়েছিলেন। প্রায় তিরিশ-হাজার ফুট উঁচুতে তাঁকে উড়তে

হয়েছিলো। ফাইটার প্লেন অবশ্য এর চেয়েও ঢের বেশি উঁচুতে উড়েছে। সেটায় অবাক হবার কারণ নেই। তবুও অতোখানি উঁচুতে উঠে এভারেস্ট-বিজয়ীদের ছবি তুলে আনার অনেক রকম হাঙ্গামা ছিলো। সেগুলি তিনি খুবই দক্ষভাবে কাটাতে পেরেছিলেন।

আর তিনি যে-ছবিগুলি তুলে এনেছিলেন তা সত্যিই বড়ো চমৎকার।

আমরা যদি ইতিমধ্যে বিমান-বিশারদ হয়ে উঠতে পারতাম আর আমাদের হাতেও যদি একখানা ওই রকম ভালো বিমান থাকতো, তাহলে—

তাহলে আমরাও হয়তো আকাশে উঠে স্বচক্ষে দেখে আসতে পারতাম এ-শতাব্দীর একটি বিস্ময়কর কীর্তি—এভারেস্ট জয়!

আমাদের দেশের সাধারণ ছেলেদের পক্ষে বিমান-বিশারদ হবার সম্ভাবনা আজ কতোখানি? আমাদের দেশে এয়ারোপ্লেনের প্রচলন আজ কতোদূর পর্যন্ত হয়েছে?

এ-দেশে এভিএশনের ইতিহাসটা একটু ভেবে দেখা যাক।

প্রথম দিকটায় নেহাতই রাজা-বাদশা আর বড়োলোকদের খামখেয়ালের মতো ছিলো। খানিকটা তাই হবার কথা। ভয়ানক খরচ-খরচার ব্যাপার যে! তাছাড়া অবশ্যই সামরিক কাজের জন্য বিমান এসেছিলো—ইংরেজ রাজত্বের সেই রয়েল এয়ার-ফোর্সের বিমান। সাধারণ বে-সামরিক লোকদের

কাছে এগুলি নেহাতই আকাশের দিকে ঘাড় তুলে অবাক হয়ে চেয়ে দেখবার বস্তু!

এদেশে যাত্রীবাহী এয়ারোপ্লেনের চলন হয়েছে কতোদিন আগে? ১৯১৯-এ। সবই কিন্তু তখন বিদেশী কোম্পানরি ব্যাপার: ইংরেজ, ফরাসী, ডাচ।

তখনকার সরকার—ইংরেজ সরকার—একটা পরিকল্পনা করলো করাচি থেকে কলকাতা পর্যন্ত নিয়মিত যাত্রী-বহনের জন্য এয়ারোপ্লেন চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু সে-পরিকল্পনা ভেস্তে গেলো। কেন? ১৯৩১-এর অর্থ-নৈতিক বিপর্যয়—সারা পৃথিবী জুড়ে তখন সাংঘাতিক অর্থনৈতিক সমস্যা, ইংরেজীতে বলে ইকনোমিক ডিপ্রেশন্।

তবুও কিছুটা এগুলো।

১৯৩১ সালে দিল্লি ফ্লাইং ক্লাবের উপর ভার দেওয়া হলো বিমানযোগে ডাক বহন করবার।

১৯৩২ সালে টাটা অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড করাচি থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত যাত্রী বহনের জন্য বিমান-চলাচলের ব্যবস্থা করলো। সপ্তাহে মাত্র একদিন করে প্লেন ছাড়বে। তখনো যাত্রী খুব বেশি হতো না। কোম্পানি চলতো প্রধানতই ডাক বহনের কাজ করে।

১৯৩৪ সালে আর-একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলো। তার কেন্দ্র দিল্লি। তার নাম ইণ্ডিয়ান ন্যাশান্যাল এয়ারওয়েস্ লিমিটেড। এই প্রতিষ্ঠানের বিমান করাচি থেকে লাহোর

পর্যন্ত যাতায়াত করতো আর ব্রিটিশ ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েস্-এর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতো।

তখন পর্যন্ত প্রধানত কী রকম এয়ারোপ্লেন ব্যবহার করা হতো ? টাটা কোম্পানি আর ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল এয়ারওয়েস—দুইই এক-ইঞ্জিন-যুক্ত হালকা প্লেন ওড়াতো। দেশের বিমান-ঘাঁটিগুলির অবস্থাও তখন নেহাত করুণ। আর আজকের দিনের তুলনায় উড়ন্ত প্লেন থেকে সংবাদ-আদান-প্রদান প্রভৃতির ব্যবস্থা বা দিক-নির্ণয় ব্যবস্থাও তখন অত্যন্ত সামান্য। তাই বর্ষায় প্লেন চলতো না! যাতায়াতের পথও খুব সংকীর্ণ ছিলো।

তবুও, বাধাবিঘ্নর মধ্যে দিয়েও, বিমান-ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।

১৯৩৮ সালে 'এম্পায়ার এয়ার মেল' বলে পরিকল্পনা চালু হলো। করাচি-মাদ্রাজ পথ ছাড়াও কলম্বোয় যাতায়াত শুরু হলো। ইম্পিরিয়াল এয়ার-ওয়েস্-এর সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্যে সপ্তাহে একদিনের বদলে পাঁচদিন করে প্লেন-চলাচল আরম্ভ হলো।

ইতিমধ্যে, ১৯৩৭ সালে, আর একটি কোম্পানী খোলা হয়েছে। তার নাম এয়ার সার্ভিসেস্ অব্ ইণ্ডিয়া। পথ : বোম্বাই-কাথিয়াড়। এই অঞ্চলে প্লেনে যাতায়াতের ভাড়া কমানের দরুন এবং সে ভাড়ার তুলনায় প্লেনে যাতায়াতের সুবিধে বাড়বার দরুন যাত্রীর সংখ্যাও বেশ বাড়তে লাগলো।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মুখোমুখি সময়ে ভারতবর্ষে বিমান-চলাচলের অবস্থা মোটামুটি কী রকম ছিলো তা ১৯৩৮-এর নিম্নোক্ত হিসেবে থেকেই অনুমান করা যাবে :

যাতায়াতের পথ	ডাকবহনের ওজন : পাউণ্ড-হিসাবে	যাত্রীসংখ্যা	মালের ওজন : পাউণ্ডের হিসাবে
করাচী-কলম্বো	৪৩০,০০০	৫১৪	১১,৮৪৫
করাচী-লাহোর	১১৭,২৭০	৯৩	৬৮
বম্বে-কাথিয়াড়	১৩৩	২১৭৫	৮৯,২৯৬

এই-কবছরে বিমানঘাঁটি প্রভৃতির অবস্থাও ধীরে ধীরে উন্নত হয়েছে। ভারতের ফ্লাইং-ক্লাবগুলিকে সাহায্য করে কিছু-সংখ্যক এ-দেশের ছেলেকে 'বি'-লাইসেন্স-যুক্ত পাইলট—অর্থাৎ পাকা-পোক্ত পাইলট—করে নেওয়া সম্ভব হয়েছে। এয়ারোড্রোমের সংখ্যা বেড়েছে, তৈরি হয়েছে নতুন হ্যাঙার (প্লেন রাখবার ঘর), মেরামতের কারখানা, ইত্যাদি।

১৯৩৯-এ যুদ্ধ শুরু হলো। যুদ্ধের কাজের জন্য বিমান-ব্যবস্থাকে উন্নত করবার প্রয়োজন হলো। রয়েল-এয়ার-ফোর্স-এর সাহায্যে টাটা এবং ইণ্ডিয়ান-ন্যাশান্যাল এয়ারওয়েজ মিলে ভারতের অভ্যন্তরে বিমান-চলাচল ব্যবস্থার অনেক উন্নতি করে তুললো। সরকারের কাছ থেকে কোম্পানিগুলি টাকা পেয়ে অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেকখানি সুনিশ্চিত অবস্থায় এলো।

পাইলট, এঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি তৈরি করবার জন্যে

তাড়াতাড়ির মধ্যে নতুন নতুন ব্যবস্থা চালু করা হলো। অতি-আধুনিক বিদেশী বিমান চলাচলের ফলে দেশের শুধুই যে এয়ারোড্রোমের উন্নতি হলো তাই নয়—এদেশের কর্মীরা নানারকম নতুন অভিজ্ঞতা ও শিক্ষালাভের সুযোগও পেলো। যুদ্ধের কয়েক বছরে দেশের কোম্পানিদুটির মোট হিসেবে :

কোম্পানির নাম	যাত্রী সংখ্যা	ডাক ও মালের ওজন : টনের হিসাব
টাটা	১২,০০০	৪০০
ইণ্ডিয়ান ন্যাশান্যাল	১০,০০০	২৫০

যুদ্ধের পর এয়ারোপ্লেন, বিমান কোম্পানির সংখ্যা যেন হুড়হুড় করে বেড়ে গেলো। ১৯৪৭ সালে নতুন একুশটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হলো—তাঁদের মোট মূলধন বেয়াল্লিশ কোটি টাকা। কোম্পানিগুলির নাম: ভারত-এয়ারওয়েস, অম্বিকা এয়ার-লাইন্‌স্‌, ডালমিয়া-জৈন-এয়ারওয়েস, ইত্যাদি ইত্যাদি।

অর্থাৎ ব্যবসাদাররা বুঝতে শুরু করলেন যে বিমান কোম্পানিতে টাকা আছে।

তাছাড়া, এ-কথাও খুবই স্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে ভারতে বিমান-ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ আছে।

নতুন বিমান-কোম্পানিগুলি সরকারের কাছ থেকে ১১৫টি ডাকোটা-প্লেন কিনলো। যুদ্ধের সময় সরকার এগুলি কিনেছিলো।

দেশে বিমান ব্যবস্থার অগ্রগতি শুরু হলো। এর পিছনে

অবশ্য ওই যুদ্ধের সময়কার কথাটা ভুললে চলবে না। যুদ্ধের সময় দেশে অনেক নতুন নতুন এয়ারোড্রোম তৈরি হয়েছে, ভারতের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ স্থাপনের জন্য নতুন নতুন পথ ঠিক হয়েছে।

তাছাড়া আর একটা খুব বড়ো কথা হলো, মেরামত প্রভৃতির জন্যে কারখানা। মেরামত এবং ওভারহল্ করবার জন্যে খুব ভালো বন্দোবস্ত করতে না পারলে দেশে বিমানব্যবস্থায় উন্নতি হতে পারে না।

হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফ্ট্ লিমিটেড-এ মেরামত ও ওভারহল্এর ব্যবস্থা রীতিমতো উন্নত হলো।

ভারতে যুদ্ধোত্তর বিমান-ব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো রাতের প্লেনে ডাক-বহন। বিকেলে চিঠি ডাকে দিলাম, রাতের প্লেনে দিল্লি বা বোম্বাই চলে গেলো,—কাল সকালেই চিঠি পৌঁছে যাবে। আজকাল ভারতের আভ্যন্তরিক ডাক যাতায়াত ব্যবস্থার বেশির ভাগটাই বিমানের সাহায্যে চলে।

কিন্তু ভারতের বিমান-ব্যবস্থা শুধুই কি ভারতের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকবে? শুধুই কি ভারতের এ-শহর ও-শহর যাতায়াত করবে?

টাটা-দের এয়ার ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশন্যাল সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করলো—ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রথম।

আজকের দিনে বিদেশে ভারতীয় বিমান-ব্যবস্থার যথেষ্ট সম্মান।

কিন্তু বিমান-চলাচলের উন্নতি সাধনে সমস্যাও আছে। সমস্যার কথা বলি।

একটা নতুন বিমান-কোম্পানি ফেঁদে বসা হয়তো ততো কঠিন নয়। যথেষ্ট পরিমাণে টাকা যোগাড় করতে পারলেই হয়। এবং দ্বিতীয় যুদ্ধের পর অনেকের হাতেই অনেক ভাবে দেদার টাকা জমেছে। তাই ব্যবসায় খাটাবার টাকা যোগাড় করাও সত্যিই তেমন অসম্ভব নয়।

কিন্তু একটা কোম্পানি ফেঁদে বসা যতো সহজ, কোম্পানিকে লাভে চালানো তার চেয়ে ঢের কঠিন। তাই যুদ্ধের পরেই কোম্পানির সংখ্যা হঠাৎ খুব বেড়ে গেলেও সব কোম্পানীর পক্ষে সমান উন্নতি করে চলা তেমন সহজ কথা হলো না। প্রথম প্রথম, কোম্পানিগুলির মধ্যে খানিকটা রেশারেশি শুরু হলো। ভাড়া কমাবার কিছুটা লক্ষণ দেখা গেল। এদিকে কিন্তু পেট্রল প্রভৃতির দাম বেড়েই চললো। বোঝা গেলো, সত্যিই যদি প্লেনের ভাড়া যথেষ্ট কমাতে হয় তাহলে আমাদের দেশ থেকেই সস্তায় পেট্রল-সরবরাহের ব্যবস্থাকে অনেক উন্নত করতে হবে।

শুধু তাই নয়। সাধারণ-ভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি যদি না হয় তাহলে শুধু এয়ারোপ্লেন কোম্পানির সংখ্যা বাড়িয়ে—বা এমনকি এয়ারোপ্লেন এবং পাইলটের সংখ্যা বাড়িয়েও—খুব কিছু উন্নতি হয় না।

যাত্রী-বাহী প্লেন কিনলাম, কোম্পানি ফাঁদলাম—কিন্তু

লোকের হাতে যদি এয়ারোপ্লেনে যাতায়াত করবার মতো যথেষ্ট টাকা না থাকে তাহলে কোম্পানী চলবে কী করে?

মাল-বাহী প্লেনের ব্যবস্থা করলাম, কোম্পানি খুললাম; কিন্তু যদি সাধারণ ভাবে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা ভালো না হয় তাহলে প্লেনগুলি কোন মাল বইবে?

প্লেন থাকলেও সে-প্লেন অকেজো হয়ে পড়ে থাকবে।

যুদ্ধের ঠিক পরেই দেখা গেলো অনেকটা এই রকম অবস্থা। অনেক কোম্পানি হয়েছে, আগের তুলনায় প্লেনের সংখ্যা প্রচুর বেড়ে গিয়েছে; কিন্তু তার মধ্যে অনেক প্লেন কাজেই আসছে না।

দেশের বিমান-ব্যবসায় সংকট দেখা দিলো। তার অবশ্য নানান দিক আছে, নানান কারণ আছে। মোটের ওপর মনে হলো, দেশে বিমান-ব্যবসাই বুঝি বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হবে।

ততোদিনে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে।

অনেকগুলি কোম্পানী সরকারের কাছে আবেদন করলো কোম্পানিগুলির দায়িত্ব যাতে সরকার গ্রহণ করে। সরকার থেকে বিমান-প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয়করণ করা হলো।

তার ফলে কিছু সমস্যার সমাধান হয়েছে। কিন্তু এখনো অনেক সমস্যা বাকি আছে।

দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক উন্নতি। তা না হলে আরো অনেক দিকের মতোই বিমান-ব্যবস্থাতেও সত্যিকারের উন্নতি হওয়া অসম্ভব।

দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক উন্নতির উদ্দেশ্যে পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার আয়োজন হয়েছে। তার সাফল্যের উপর অবশ্য আমাদের ভবিষ্যৎ অনেকদিক থেকেই এবং অনেকখানিই নির্ভর করছে।

কিন্তু এখানে সাধারণ-ভাবে দেশের সমস্ত সমস্যা নিয়ে তো আর আলোচনা করা যায় না। কিন্তু মনে রাখা দরকার, দেশের বিমান-উন্নতির সমস্যাকে ওই সাধারণ সমস্যাগুলি থেকে স্বতন্ত্র করে, আলাদা ভাবে, বোঝবার উপায় নেই।

আমরাও হতে পারি

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

এক : বিদ্যুৎ-বিশারদ : দেবীদাস মজুমদার

দুই : মুদ্রণ-বিশারদ : অশোক ঘোষ

তিন : মোটর এঞ্জিনিয়ার : দেবীদাস মজুমদার

চার : বীক্ষণ-বিশারদ : কমলেশ রায়

পাঁচ : বিমান-বিশারদ : দেবব্রত বসু

ছয় : রেডিও-বিশারদ : জ্যোতির্ময় দে

সাত : ফোটোগ্রাফার : কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ইত্যাদি ইত্যাদি

আমরাও হতে পারি—শুধু তাই নয়, আমাদেরও হতে হবে। কেননা আজ আমাদের দেশ একটা প্রকাণ্ড যুগ-পরিবর্তনের মুখোমুখি এসে পৌঁছেছে—হাজার বছরের পুরোনো যে-অচল খোঁটায় আমাদের ভাগ্য বহুদিন বাঁধা পড়ে ছিলো তা উপড়ে ফেলে বিদেশী শাসনমুক্ত এই দেশকে শিল্পে, ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে হবে। আজ আর যন্ত্রকে ভয় পেয়ে বসে থাকা চলবে না—হাতের কাজকে ছোট মনে করবার, ঘৃণা করবার দিন নয় আর। তাই এই গ্রন্থমালার পরিকল্পনা। যাঁদের দিয়ে বইগুলি লিখিয়েছি তাঁরা প্রত্যেকেই নিজের বিভাগে বিশেষজ্ঞ। তাঁদের বলেছি : আপনাদের ওই জ্ঞানের ঐশ্বর্যই আজ একটা ঋণ হয়েছে—দেশের কিশোর-কিশোরীদের কাছে ঋণ। আপনারা যা জেনেছেন, শিখেছেন তা সহজ করে ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে, যাতে যন্ত্র-কৌশলের নানা বিভাগে ওরা সত্যিই আগামীকালের বিশারদ হয়ে ওঠে।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়